দাম : দশ টাকা

৭০ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ১১ ডিসেম্বর ২০১৭
২৪ অগ্রহায়ণ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯
website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

মা ত্রিপুরাসুন্দরী

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১১ ডিসেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বিভিন্ন শতাব্দীতে ত্রিপুরা ▯ জগদীশ গণচৌধুরী ▯ ৭

স্বাধীনতার সূর্যোদয় থেকে নতুন প্রভাত পর্যন্ত ব্যক্তি নির্মাণের পথে অগ্রসর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তিন দশকের ইতিহাস ▯ রঙ্গা হরি ▯ ১১

ত্রিপুরায় সঙ্ঘ— গণেশদা থেকে গুরুদা ▯ অভিমন্যু রায় ▯ ১৬

ত্রিপুরার সাধক-সাধিকা ▯ প্রদীপ আচার্য ▯ ২২

শহিদ সন্ত গুরুদেব শ্রীশ্রীশান্তিকালী ▯ ডা: অতুল দেববর্মা ▯ ২৪

চিরায়ত ঐতিহ্যের ধারক মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ▯ দীপক কুমার দেব ▯ ২৭

ত্রিপুরার জাতীয় ব্যক্তিত্ব ▯ ভাস্কর রায় বর্মণ ▯ ২৯

ত্রিপুরার অর্থনীতিতে কৃষি ▯ ড. নীলাদ্রি পাল ▯ ৩২

উপযুক্ত জবাব দিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে হবে ▯ সৈয়দ আটা হাসনাইন ▯ ৩৫

বাংলার নবজাগরণে পদ্মিনী উপাখ্যান ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ৩৭

উত্তরপ্রদেশের পুরভোটে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়, গুজরাটেও প্রভাব ফেলবে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৪১

খোলা চিঠি : শীত পড়বে কিন্তু দিদির উৎসবের কী হবে? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বয়ংসেবক মনোজ উপাধ্যায়ের হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

দলতন্ত্র উপেক্ষিত হলে পশ্চিমবঙ্গের শাসক ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একথা গত চল্লিশ বছর ধরে সত্যি। সম্প্রতি ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়ের হত্যাকাণ্ডে সেই সত্য আরও একবার প্রমাণিত হলো। মনোজের অপরাধ, তিনি তৃণমূলের মাফিয়াদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে ভদ্রেশ্বর পৌরসভাকে সুন্দর ভাবে চালাতে চেয়েছিলেন। দলের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে চেয়েছিলেন প্রশাসনকে। কিন্তু তিনি সম্ভবত জানতেন না পশ্চিমবঙ্গে বাস করে এসব করা যায় না। তাই মাশুল দিতে হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ প্রশিক্ষিত এই স্বয়ংসেবককে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা মনোজ উপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত বিশেষ স্মরণসংখ্যা। লিখছেন— এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হাদিয়া ও ধর্মপরিবর্তন

কেরলে অখিলা অশোকন ওরফে হাদিয়া-র ঘটনাটি এখন চর্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কেরল হাইকোর্ট হাদিয়ার সহিত শাফিন জাহানের বিবাহ 'লাভ জিহাদ' হিসাবে মানিয়া ইহাকে অসিদ্ধ বলিয়া রায় দিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি বিচারের জন্য উত্থাপিত হইলে সেখানেও হাদিয়া এই বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দাবি করিয়াছে এবং শফিন জাহানকেই সে স্বামী হিসাবে পাইতে চায় বলিয়া জানাইয়াছে। এই কারণেই সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। একজন মহিলা হিসাবে নিজের ধর্ম পরিবর্তন বা কাহাকে স্বামী হিসাবে নির্বাচন করিবার পূর্ণ অধিকার হাদিয়ার আছে। কিন্তু হাদিয়ার বিষয়টি এই কারণে চর্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার পরিবার এই বিবাহে আপত্তি জানাইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ জোর-জবরদস্তি করিয়া হাদিয়াকে ধর্ম পরিবর্তন করানো হইয়াছে। তাহারা ইহাকে 'লাভ জিহাদ' বলিয়াছে।

অন্যদিকে হাদিয়া ওরফে অখিলা অশোকনের স্বামী শাফিন জাহানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেটের যোগ ছিল বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ। হাদিয়ার সঙ্গে বিবাহের আগে উমর-অল-হিন্দ মামলায় ধৃত দুই অভিযুক্ত মনসিদ ও পি সাফভানের সঙ্গে শাফিনের যোগাযোগ ছিল বলিয়া এন আই এ জানাইয়াছে। শাফিনের সহিত পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার মহিলা শাখারও যোগাযোগ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া এমন একটি ইসলামি গোষ্ঠী যাহারা এক অধ্যাপকের হাত কাটিয়া লইয়াছিল।

হাদিয়ার বক্তব্যকে যাহারা সমর্থন করিতেছে তাহাদের বক্তব্য হইল এন আই এ-র কাজ দেশের সুরক্ষা, কাহারও ব্যক্তিগত বিষয় ইহার তদন্তের বিষয় হইতে পারে না। আসাদুদ্দিন ওবেইসি, বারিস পটানের মতো যে ব্যক্তিরা হাদিয়াকে সমর্থন করিতেছে, তাহারাই তিন তালাকের বিরোধিতা করিয়াছে। নিজেদের মতের হইলে সব কিছু ঠিক, আর অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারকেই বড় করিয়া দেখানো হইতেছে। কেরলে ধর্মপরিবর্তনের বিষয়টি আজকের নয়। প্রায় দশ বছর আগে এক বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের এক বরিষ্ঠ নেতা অভিযোগ করিয়াছিলেন, মুসলমানরা আমাদের মেয়েকে ইসলামে ধর্মান্তর করিয়া বিবাহ করে। হাদিয়ার ঘটনায় একটি নূতন মাত্রা যুক্ত হইয়াছে। কেরলের বামপন্থী সরকার সুপ্রিমকোর্টে এন আই এ-র অভিযোগকে সমর্থন করিয়াছে। অর্থাৎ কেরলের বামপন্থী সরকারও মনে করে অখিলাকে জোরজবরদস্তি মুসলমান করা হইয়াছে। কেরলের বামপন্থীরাই এখন বলিতেছে পেট্রোডলারের মদতে কেরলে বড় বড় মসজিদ তৈরি হইতেছে। কেরলের মাতা-পিতারা তাই নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ লইয়া চিন্তিত। তাহাদের সন্তানেরাও যদি এই ফাঁদে পড়িয়া যায়!

ভারতে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া অনেকদিন হইতেই—মোগল শাসনকাল হইতেই চলিতেছে। এক সময় সমগ্র কাশ্মীর হিন্দু-অধ্যুষিত ছিল। ধর্মান্তরকরণের ফলে আজ কাশ্মীর উপত্যকায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহার পরিণতি কী আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছি। বস্তুত ভারতবর্ষের যে অঞ্চল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে, সেই সেই অঞ্চলই ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ ইহার উদাহরণ। কাশ্মীর ও সম্প্রতি অসমেও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়াজ তুলিয়াছে। তাই হাদিয়ার ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া ভাবিলে ভুল হইবে। ধর্মান্তরকরণের ভয়াবহ পরিণতির প্রেক্ষাপটেই বিষয়টি বিচার করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।

নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধঃ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা।।

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা—এই ছ'টি ব্যক্তির পতনের কারণ হয়।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

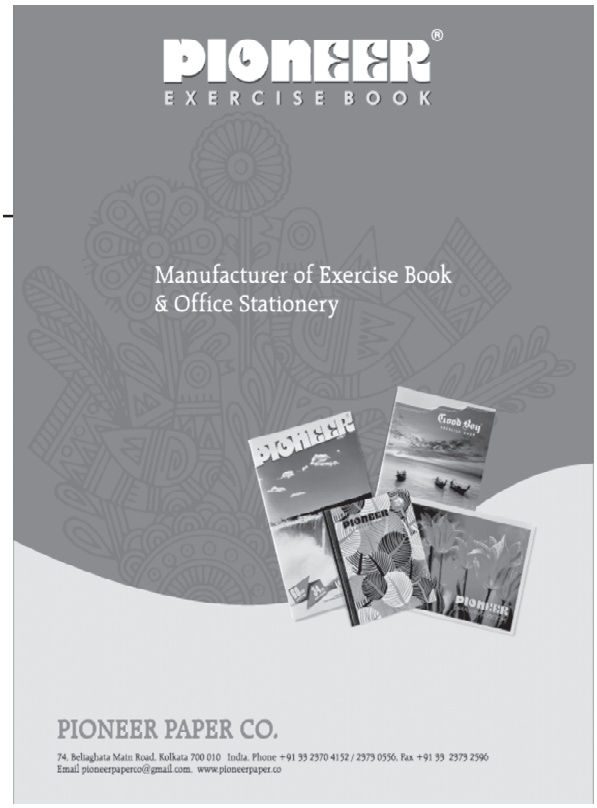

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

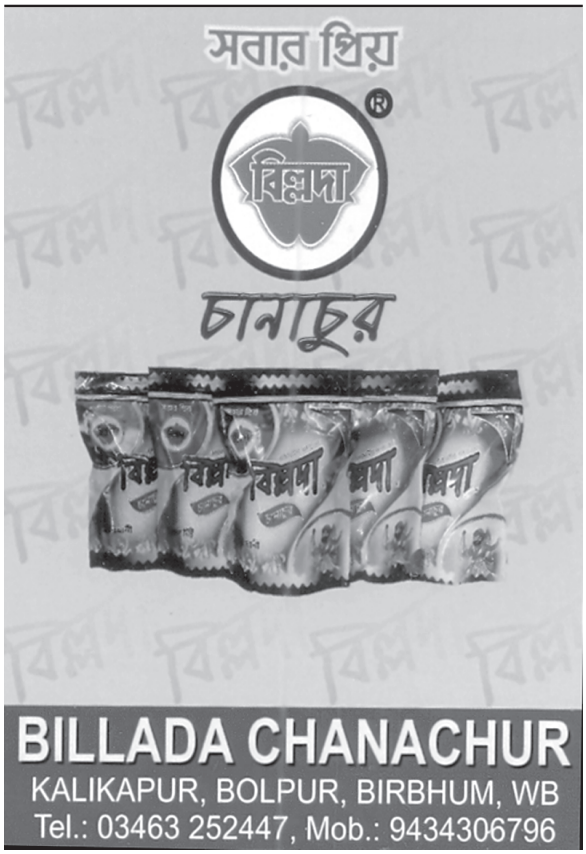

বিভিন্ন শতাব্দীতে ত্রিপুরা

ড. জগদীশ গণচৌধুরী

অতীতের দিকে অবলোকন করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে ত্রিপুরারাজ্যের সীমা ও সংস্কৃতি কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। মুখ্যত বৈদেশিক আক্রমণের ফলে সীমা সংকোচিত হইয়াছে; ত্রিপুরার কতিপয় রাজার দিগ্বিজয়ের ফলে সীমা সম্প্রসারিত হইয়াছে। সম্প্রসারণ ও সংকোচন, অর্জন ও বর্জন কয়েক শতাব্দী যাবৎ অব্যাহত ছিল। বঙ্গদেশে যতদিন শশাঙ্ক, পাল ও সেন বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, ততদিন ত্রিপুরা ছিল নিরাপদে। বঙ্গদেশে আফগান, তুর্কি, পাঠান ও মোগল আমলে এবং ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরার সীমা ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল। শুধু তাই নয়, বৈদেশিক আক্রমণের পূর্বে, ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানান্তর ঘটিয়াছে। অর্থাৎ সুদূর অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান অন্যত্র ছিল।

ত্রিপুরা নিঃসন্দেহে প্রাচীন দেশীয় হিন্দু রাজ্য। কিন্তু কতটা প্রাচীন? কেবলমাত্র ***শ্রীরাজমালা ও শ্রীরাজরত্নাকরম্*** নামক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়তো যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই দুই গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ যযাতির পুত্র দ্রুহ্য হইলেন ত্রিপুরার আদি রাজা। কিন্তু আদি রাজা ও তাঁহার অধঃস্তন অনেক রাজার আয়ুষ্কাল ও রাজত্বকাল লিপিবদ্ধ না থাকাতে, তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যায়। দ্রুহ্য যদি প্রথম রাজা হন, তবে তাঁহার অনেক পরবর্তী রাজা, তথা ১১৬তম রাজা আদি ধর্ম্মপা বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ***রাজমালা***-তে বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা সত্য হইবার সম্ভাবনা বেশি। তাই সেই সময় হইতে ত্রিপুরার ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

সপ্তম শতাব্দীতে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যজ্ঞানুষ্ঠান। ঘটনাকাল ৫১ ত্রিপুরাব্দ, অর্থাৎ ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ। উদ্যোগী রাজা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা— আদি ধর্ম্মপা, কিরীট, দানকুরুফা, ডুঙ্গুরুফা, হরিরায়। তাঁহার ক্রমিক সংখ্যা ১১৬। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (৬০০-৬৬৪ খ্রি.) এবং আদি ধর্ম্মপা ছিলেন সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বকাল আনুমানিক ৬৩৫-৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ। বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী রাজা ছিলেন শশাঙ্ক (৬০০-৬৩৭)।

মিথিলা হইতে সসম্মানে আনীত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের জন্য প্রদত্ত ভূমি **পঞ্চখণ্ড** নামে অভিহিত হইল কালক্রমে। সেই পঞ্চখণ্ড নাম এবং ওই ব্রাহ্মণদের বংশধর খ্রিস্টীয় একবিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান আছে। নবাগত ব্রাহ্মণরা 'সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইল। সেই পরিচয় অদ্যাপি বিদ্যমান। যজ্ঞস্থল আজও (১৯৯৯ খ্রি.) লোকস্মৃতিতে জাগ্রত। অপেক্ষাকৃত অনেক পরে শ্রীহট্টের বড়কাপন নামক গ্রাম-নিবাসী পণ্ডিত শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য ***বৈদিক সংবাদিনী*** নামক গ্রন্থে ওই যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কালের নিয়মে ইতিমধ্যে কয়েকটি শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এইসব শতাব্দী তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে পঞ্চদশ শতাব্দী ত্রিপুরার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। চন্দ্রবংশের দুইজন কুলভূষণ জন্মগ্রহণ করেন এই সময়। তাঁহাদের নাম ধর্ম মাণিক্য এবং ধন্য মাণিক্য। তাঁহাদের প্রধান প্রধান কীর্তি হইল রাজ্য বিস্তার, ইতিহাস লিখন, জলাশয় খনন, মন্দির নির্মাণ, ভূমিদান, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা স্থাপন, সেনাবল দৃঢ়করণ ইত্যাদি।

বঙ্গদেশে নবাবি আমল বাংলার সামাজিক জীবনে প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজা গণেশের ক্ষণিক শাসনকাল (১৪১৪-১৪১৮) স্বস্তি আনিয়াছিল। রাজা গণেশের পুত্র যদু সংকটকালে ধর্মান্তরিত হইয়া নাম নিল জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩৩)। নব দীক্ষিত জালাল অতি উৎসাহী হইয়া অত্যাচারের ধারা অব্যাহত রাখিল। ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম,

সিপাহিজলা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙচুয়ারি

সিপাহিজলা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাঙচুয়ারি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ত্রিপুরার অভয়ারণ্য। বিশালগড়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই অভয়ারণ্য। এখানেই রয়েছে প্রাকৃতিক বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং চিড়িয়াখানা। এই অভয়ারণ্যের সম্পদ হলো ক্লাউডেড লেপার্ড। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি এবং বিশেষ ধরনের বাঁদর। পরিযায়ী পাখিরা এখানে আসে শীতের সময়। অভয়ারণ্যের মধ্যেই রয়েছে কৃত্রিম হ্রদ। নাম অমৃতসাগর। এখানে বোটিং করা যায়। যাঁরা জঙ্গলে বেড়াতে ভালোবাসেন তাদের জন্য রয়েছে একটি ডাকবাংলো। নাম অবসরিকা।

বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি

ত্রিপুরার পাবলিক লাইব্রেরিগুলির মধ্যে বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কুলীন শ্রেণীভুক্ত। লাইব্রেরিটির প্রতিষ্ঠা ১৮৯৬ সালে। তখন ত্রিপুরা রাজবংশের শাসনাধীন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য রাজপ্রসাদেই একটা লাইব্রেরি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেই লাইব্রেরিই আজকের বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। এখানে বাংলা ও ইংরেজি বইয়ের সংগ্রহ দেখার মতো। বারকয়েক বাড়ি বদলের পর ভি.এম চৌমোহনিতে (বর্তমানে আই.জি.এম. চৌমোহনি) উঠে আসে। লাইব্রেরির নামকরণ করেছেন মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।

পশ্চিম ও উত্তর দিকে মুসলমান শাসন পুরাদমে চালু হইল। খাজনা, উপঢৌকন, উপহার দিতে বিলম্ব ঘটিলে যথোচিৎ শিক্ষা দিত ত্রিপুরার রাজাকে ও রাজ্যবাসীকে। ফলে ত্রিপুরার রাজার সহিত বাংলার নবাবের সংঘর্ষ দেখা দিল। ধন্য মাণিক্য বনাম হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) সংঘর্ষ এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ঘটে। জোর যার, মুলুক তার— এই মতবাদের নির্মম ব্যবহার ঘটিল। অনুন্নত, অশিক্ষিত, কৃষিনির্ভর ত্রিপুরাকে সজোরে আঘাত করিল নবাবি আমল। বহু বাঙালি হিন্দু ইসলামে ধর্মান্তরিত হইল ছলে-বলে।

ষোড়শ শতাব্দীর বহু ঘটনা ***রাজমালা*** নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা হইলেন বিজয় মাণিক্য। ধন্য মাণিক্যকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধরিলে, ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা নিঃসন্দেহে বিজয় মাণিক্য।

বঙ্গদেশ-সহ সমগ্র ভারতে তখন বিদেশাগত মোগল শক্তি দাপটে রাজত্ব করিতেছিল। ত্রিপুরার উপর নানারকম চাহিদার চাপ আসিতেছিল মোগল শাসনের নিকট হইতে। এই সময়ে আত্মঘাতী মারাত্মক কলহে দেব মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য নিহত হইয়াছেন রাজবাড়িতে আত্মীয়দের দ্বারা।

ষোড়শ শতকে ত্রিপুরাবাসী চরম অনিশ্চয়তা, অশান্তি, উপদ্রবে কালাতিপাত করিয়াছে। বহু বাঙালি ধর্মান্তরিত হইয়াছে। ত্রিপুরা ষোড়শ শতকে ছিল অনুন্নত, কৃষিনির্ভর, প্রশাসনিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বৈদেশিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত। জনজীবন হইতে শান্তি ডানা মেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে পর্তুগিজ জলদস্যুরা প্রথম পদার্পণ করে। অতঃপর তাহারা প্রায় প্রতি বৎসর আসিত এবং নানারকম অত্যাচার করিত। তাহাদের সঙ্গে হাত মিলাইল মগ জনগোষ্ঠী। ফিরিঙ্গি ও মগ এই উভয়ের অত্যাচারে বহু হিন্দু চট্টগ্রাম হইতে উত্তরে নোয়াখালিতে আসিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী ***রাজমালা*** গ্রন্থে আংশিক লিপিবদ্ধ আছে। সপ্তদশ শতকে প্রকৃতপক্ষে সাত জন রাজা রাজত্ব করেন। সপ্তদশ শতকে এমন কোনো রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি ধন্য মাণিক্য ও বিজয় মাণিক্যের ধারে-কাছে আসিতে পারেন। অন্তর্ঘাত ও বহিরাঘাত এই শতকে ত্রিপুরাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দী হইল ত্রিপুরার আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাবলী ***রাজামালা***-তে নাই। রাজমালা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন কৃষ্ণ মাণিক্য। কৃষ্ণমাণিক্যের আমলের ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত ***কৃষ্ণমালা*** ত্রিপুরার ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

অষ্টাদশ শতকের ঘটনাবলী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমসের গাজির উত্থান ও পতন, কৃষ্ণমাণিক্যের বনবাস ও প্রবল উদ্যম, মোগল শক্তির পতন, পলাশির যুদ্ধ ও ইংরাজের আবির্ভাব ইত্যাদি অষ্টাদশ শতকের মুখ্য ঘটনা। ইহা এক যুগসন্ধিক্ষণ। পাঠান-মোগল শাসন ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত প্রভেদ লক্ষণীয়।

ঊনবিংশ শতকের ঘটনাবলী ***রাজমালা*** গ্রন্থে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনার আকার-প্রকার ভিন্ন প্রকৃতির। অসির স্থলে মসী প্রাধান্য পায় এই সময়। হাজার হাজার মণিপুরী উদ্বাস্তু আগমণ, পাশ্চাত্য ধরনের পৌরসভা গঠন, বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ডাকঘর প্রবর্তন, আইন প্রণয়ন, জনগননা শুরু, সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের মুখ্য ঘটনা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ত্রিপুরাকে যৎসামান্য প্রভাবিত করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজজীবনে নবজাগরণ আসিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষী ছিলেন এই নবজাগরণের পথিকৃৎ। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন বীরচন্দ্র। রাজার অনুকরণে ও উৎসাহে প্রজাদের মধ্যেও কাব্যচর্চা, নৃত্যচর্চা, সংগীতচর্চা, বিদ্যাচর্চা, বাদ্যচর্চা, চারুশিল্প চর্চা, চিত্রাঙ্কন চর্চা প্রভৃতির জোয়ার আসিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্ধকার দিক্ হইল কুকি আক্রমণে সমতলের জনজীবনে ব্যাপক ত্রাস; কাশীচন্দ্র ও কৃষ্ণকিশোরের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ওয়াখিরায় হাজারীর অত্যাচার এবং প্রতিবাদী জমাতিয়া সমাজভুক্ত ২০০ জনকে হত্যা; রাজপরিবারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর আকাশে মেঘগর্জন ও বজ্রপাত নাই; কালবৈশাখীর ঝড়-তুফান ছিল।

বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী ***রাজামালা*** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই; কিন্তু ইংরাজিতে লেখা বার্ষিক প্রতিবেদন সমূহে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসকদের লেখাতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ রাজতান্ত্রিক, দ্বিতীয়ার্ধ গণতান্ত্রিক।

বিংশ শতক হইল আবেগময়, উত্তেজনাপূর্ণ, ঘটনাবহুল, বৈপ্লবিক ও রক্তাক্ত শতাব্দী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, ভারত বিভাজন, উদ্বাস্তু আগমন, পাকিস্তানি আক্রমণ, চীনা আক্রমণ, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম প্রভৃতি ঘটনাবলী ত্রিপুরাকে প্রভাবিত করিয়াছে। সপ্তদশ শতকের ইউরোপ যেমন রক্তাক্ত, বিংশ শতকের ভারত তেমনি রক্তাক্ত। ক্বচিৎ একটি দিন গিয়াছে রক্তপাতহীন অবস্থায়। প্রতিদিন অগ্নিসংযোগ, নরহত্যা, লুঠ চলিতেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিপুরার যোগদান, ত্রিপুরার উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দকরণ; চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, যাতায়াত, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি, বহু আইন প্রণয়ন প্রভৃতি বিংশ শতকের ত্রিপুরার ইতিবাচক দিক। কিন্তু বিংশ শতকের নেতিবাচক দিক অধিক ভয়াবহ। দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের যুদ্ধখাতে ত্রিপুরা বিপুল অর্থদান করিয়াছিল। এতবেশি অর্থদান ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। মুসলমানের অত্যাচারে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে হাজার হাজার চাকমা, মগ জনগোষ্ঠী ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়াছিল; তেমনি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, শ্রীহট্ট হইতে কয়েক লক্ষ বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়াছে। ইহাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মে মহারাজ বীর বিক্রমের মহাপ্রয়াণ ঘটে। অতঃপর অভিভাবকহীন ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে ভয়াবহ রূপ নিয়াছিল। সেই ষড়যন্ত্রে স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি লিপ্ত ছিল। ইহাতে ত্রিপুরার ক্ষতি হইল বিপুল পরিমাণ। সমগ্র ত্রিপুরাকে পাকিস্তানভুক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পর, ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ চাকলা রোশনাবাদ যাহাতে পাকিস্তানভুক্ত করা যায় সেই চেষ্টা চলিল। সেই চেষ্টা সফল করিতে নোয়াখালি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে হিন্দু নিধনমূলক দাঙ্গা হইল। পশ্চিমাংশ পাকিস্তানভুক্ত হইল।

পশ্চিমাংশ হইতে নির্যাতিত হিন্দুদের আগমন ঘটিল পূর্বাংশে। অতঃপর এইসব নির্যাতিতদের বিরুদ্ধে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হইল। নির্যাতিতরা ফুটবল সদৃশ হইয়া উভয়পক্ষের লাথি খাইতে থাকিল। সেই লাথি খাওয়ার ঐতিহ্য বিংশ শতকের অন্তিমকালেও অব্যাহত রহিয়াছিল। উদ্বাস্তুদের কর্মদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানে ত্রিপুরার কৃষি, যাতায়াত, যোগাযোগ, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতি হইয়াছে দ্রুত; কিন্তু উদ্বাস্তুদের পক্ষে ত্রিপুরার পূর্বভাগের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বসতিস্থাপন করা দূরদর্শিতার অভাব সূচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গঠন করা হইল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ।

বিংশ শতাব্দীর আর এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হইল কতিপয় সম্প্রদায়কে চিহ্নিতকরণ ও তাহাদের দ্রুত উন্নতির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান। ইহাদের নয়া নামকরণ হইল তফশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি অথবা অনুসূচিত জাতি ও উপজাতি। স্বাধীন ভারতের প্রশাসন এই দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়া প্রশংসনীয় সফলতা লাভ করিয়াছে। প্রতি দশ বৎসর করিয়া এই সব সুবিধার সময়সীমা সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু কালক্রমে ইহাতে রাজনীতির ও সংকীর্ণ স্বার্থের অনুপ্রবেশ ঘটিল।

হোজাগিরি নাচ

হোজাগিরি নাচ ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান একটি লোকনৃত্য। হোজাগিরি উৎসবের (লক্ষ্মীপুজো) সময় এই নাচ হয়। এদিন দেবী মইলুমা (লক্ষ্মী) পূজিত হন। এই নাচ শুধুমাত্র মেয়েরাই নাচতে পারে। চার থেকে ছ'জনের দল করে নাচতে হয়। রিয়াং জনজাতির মধ্যেই এই নাচের চল রয়েছে। পুরুষদের কাজ গান গাওয়া। কিংবা, খাম সুমুই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো। প্রশিক্ষণ না নিয়ে হোজাগিরি নাচা যায় না। এই নাচকে বাঁচিয়ে রাখতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন সত্যরাম রিয়াং। তিনি সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার পেয়েছেন।

বিংশ শতকের অন্যতম ঘটনা হইল বহু সঙ্ঘ-সমিতির উদ্ভব। সমাজবিদ্যার দৃষ্টিতে এইসব সমিতি হইল গৌণ গোষ্ঠী। সংখ্যায় ইহারা অগণিত, চরিত্রে ইহারা বিচিত্র, কার্যকলাপে বিতর্কিত। রাজনৈতিক দলের শাখা-প্রশাখা হিসাবে কতিপয় সংস্থা বা সঙ্ঘ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কাজ করে। যৌথ পরিবারের স্থলে ছোট পরিবারের আবির্ভাব, সম্প্রদায়ের স্থলে সঙ্ঘ-সমিতির ক্রম বর্ধমান প্রভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রিপুরাতে জনগণনার প্রাচীন ঐতিহ্য আছে বলিয়া দাবি করা হয়, কিন্তু সেই কালের লোকসংখ্যার কোনো লিখিত প্রমাণ দুর্লভ। ত্রিপুরার লোকসংখ্যার একটি বিশিষ্ট অংশ হইল ত্রিপুরী সম্প্রদায়। ত্রিপুরার ইতিহাসে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ত্রিপুরীদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। রাজ-আমলে ইহারা ত্রিপুরক্ষত্রীয় নামে অভিহিত হইত। অতঃপর তাহারা তপশিলভুক্ত উপজাতি নামে পরিচিত হইল।

ত্রিপুরাতে বহু সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। আকারে প্রকারে প্রভাবে সম্প্রদায়গুলি অসমান। বৃহত্তর ত্রিপুরী জনসমাজের মধ্যে দেববর্মন সম্প্রদায় সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তেমনি বৃহত্তর বাঙালি জনসমাজের মধ্যে দেবনাথ সম্প্রদায় সবচাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেববর্মন সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন করিয়াছিল। দেববর্মন সম্প্রদায়ের অপরাপর নাম হইল পুরাণ ত্রিপুরী এবং দেববর্মা। ত্রিপুরার অধিকাংশ সম্প্রদায় আবার কতিপয় বংশ বা গোষ্ঠী লইয়া গঠিত। বংশকে দফা বা পাঞ্জি বলা হয়।

ত্রিপুরার অতি প্রাচীন রাজাদের স্থাপত্যশিল্প সংক্রান্ত কীর্তি স্বল্পজ্ঞাত। দ্রুহ্য হইতে মহামাণিক্য অর্থাৎ ১ হইতে ১৪২ সংখ্যক রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কাজে উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু প্রামাণিক তথ্যের অভাব। যেমন ৪১তম রাজা ত্রিলোচন এবং ১১৬তম রাজা আদি ধর্ম্মফা খুব সম্ভবত দেবালয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু সেইসব মন্দির এখন নিশ্চিহ্ন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ১ হইতে ১৮০ সংখ্যক রাজার শাসনকালে কী কী রাজকীয় আদেশ, নির্দেশ, নিয়ম, নীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা জানার উপায় প্রায় নাই। ১৮১ তম রাজা বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রণীত আইনের নিদর্শন বিনষ্ট হয় নাই। ১৮১ হইতে ১৮৫ তম রাজার শাসনকালে (১৮৬২-১৯৪৯ খ্রি.) বহু আইন প্রণীত হইল। এই সব আইন প্রণয়নের পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইহার পূর্ববর্তী ত্রিপুরার প্রশাসন ছিল পিতৃতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক। ইহাকে নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য ২৭.৮.১৮৭৩ দিনাংকে নিযুক্ত হন বাবু নীলমণি দাস। দেওয়ান নীলমণি দাস লিখিত আইন প্রণয়নের কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অতঃপর ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক খেলাস ছাড়িয়া ক্রমেই আধুনিক রূপ নিতে লাগিল।

এই রকম এক সময়ে ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা যোগদান করিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত। অন্যথায় ত্রিপুরার অস্তিত্ব বিপন্ন হইত। অতঃপর বহু ভারতীয় আইন ত্রিপুরাতে সম্প্রসারিত হইল। এমনকী ব্রিটিশ আমলে প্রণীত একাধিক আইন ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য হইল।

বস্তুতপক্ষে ১৮৭২ হইতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ত্রিপুরাতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। এই সময়ে বহু নিয়মনীতি লিখিতরূপে প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বার্তালয় স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি মহকুমায় ও তহশিলে বিভক্ত করা হইয়াছে। আধুনিক আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিচার বিভাগ সমহিমায় ক্রিয়াশীল হইয়াছে। দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ ত্রিপুরার অর্থনীতিকে তথা রাজকোষকে প্রায় দেউলিয়া করিয়াছিল। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সংকোচিত ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়াছে। উদ্বাস্তু-বিরোধী আন্দোলন ত্রিপুরীদের মনে দানা বাঁধিয়াছে। ভারত সরকারের আর্থিক অনুদানে টাকার প্লাবন বহিতে শুরু করিল ত্রিপুরাতে। বৈষয়িক প্রাচুর্য অকস্মাৎ বাড়িয়া গেল এবং পাশাপাশি মূল্যবোধের অধঃপতন বিপরীত অনুপাতে ঘটিতে থাকিল। ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ত্রিপুরার উপর প্রত্যক্ষরূপে প্রভাব ফেলিল। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ণরাজ্য রূপে উন্নীত হইল।

(লেখকের 'ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে সংকলিত)

বিজু নাচ

বিজু চাকমাদের নাচ। বিজু কথাটির অর্থ চৈত্র সংক্রান্তি। ওই দিনটি বাংলা ক্যালেন্ডারের শেষ দিন। পুরনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য এদিন চাকমারা নাচে, গান গায়। চাকমাদের এই নাচগান তাল-সুর-ছন্দে বর্ণময় হয়ে ওঠে। বিশেষ যে বাদ্যযন্ত্র দুটি বাজানো হয় তাদের নাম খেনগারাং এবং ধুকুক। ধুকুক এক ধরনের বাঁশি। চাকমা মহিলারা ফুল ভালোবাসেন। খোঁপায় ফুলের ব্যবহার তাদের একটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া ব্যবহার করেন নানারকম ধাতু দিয়ে তৈরি অলংকার।

বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীনতার সূর্যোদয় থেকে নতুন প্রভাত পর্যন্ত

ব্যক্তি নির্মাণের পথে অগ্রসর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তিন দশকের ইতিহাস

রঙ্গা হরি

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ এই তিন দশক অথবা ত্রিশ বছরকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিকাশযাত্রার দ্বিতীয় চরণরূপে দেখা যেতে পারে। কেননা এই সময়কালের মধ্যে সঙ্ঘ সংগঠন থেকে আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। ১৯৪৭ সাল দেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় এবং ১৯৭৭ সাল দেশবাসীর হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সাক্ষী থেকেছে। স্বাধীনতা-প্রভাতের নায়ক ছিলেন পিতা এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দেশবাসীর স্বাধীানতা হরণের খলনায়িকা ছিলেন তাঁর কন্যা।

১৯৫০ সালের সেই প্রভাত আমার খুব ভালো ভাবে মনে আছে, যেদিন সঙ্ঘের নতুন ভূমিকা আমি উপলব্ধি করতে পারলাম। ১৯৪৭ -এর মে মাসে সঙ্ঘের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করতে আমি চেন্নাই গিয়েছিলাম। তখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হতো, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ছিল— 'আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য...'। এরপর সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে দু'বছর পর ১৯৫০ সালে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়। দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের জন্য আমি আবার শিবিরে গেলাম। সেখানে আমার পূর্বপরিচিত স্বয়ংসেবকদের থেকে জানতে পারলাম যে, এবার প্রতিজ্ঞায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে 'আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে'-র বদলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'আমাদের মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিবার জন্য' বলতে হবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞার ভাষা বদল করা হয়েছিল। দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংগঠনের কাছে আশা করা হয়েছিল যে, মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কাজ করার। সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যও এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। পরের তিন দশক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বহু ঘটনার সাক্ষী থাকেন। যেমন--- ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ১৯৫৫-তে গোয়া মুক্তি অভিযান, ১৯৫৬-তে ভাষা অনুসারে রাজ্য গঠন, ১৯৬২-তে চীনা আক্রমণ, ১৯৬৩-তে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতাব্দী, ১৯৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৯৭১ পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ। ১৯৭৫-এ তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বৈরাচারী শাসন অর্থাৎ সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি এবং ১৯৭৭-এ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৯৭৩ সালে শ্রীগুরুজীর প্রয়াণের পর শ্রদ্ধেয় বালাসাহেব দেওরস সংগঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে সঙ্ঘ এমন এক অখিল ভারতীয় রূপ গ্রহণ করে যার বিভিন্ন কার্যকলাপ দেশের কোণে কোণে বিস্তার লাভ করে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে যায়। সঙ্ঘের বিশাল পরিকাঠামোয় হাজার হাজার যোগ্যতাসম্পন্ন দায়িত্ববান যুবক কাজে লেগে পড়ে এবং তাদের নেতৃত্বের কোনোপ্রকার খামতি ছিল না। সঙ্ঘের মধ্যে সবাই সমান এবং

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে (বাঁ দিক থেকে) স্বামী চিন্ময়ানন্দ, শ্রীগুরুজী, বাবাসাহেব আপ্তে, তুকাডাজী মহারাজ এবং শঙ্করাচার্য।

সরসঙ্ঘচালক তাদের পথপ্রদর্শক। সংগঠনের কাঠামো বড় একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের মতো এবং যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কোনো ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতায় সঙ্ঘকে নতুন দিশা অথবা নতুন ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার পরামর্শ দিতে পারেন।

ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক ও সামাজিক স্তরে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক উপরোক্ত বিষয়গুলি গভীরভাবে অনুধাবন করেন এবং সেইমতো কাজ করেন। চ্যালেঞ্জকে তাঁরা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন, যা তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করে। সংক্ষেপে, এই তিন দশকের সঙ্ঘ-গাথা এরূপ ছিল।

বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শ বলে থাকেন যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের স্বরূপে সংশোধন জরুরি। কিন্তু এক আদর্শবাদী ব্যক্তির জন্য আদর্শে নয়; বরং আদর্শের অনুকূলে করা কাজের সংশোধন করা বেশি প্রয়োজন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেক সদস্যকে আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর মধ্যেই নেতৃত্বের কুশলতা নিহিত রয়েছে। সঙ্ঘ এই ভাবনার প্রতি সর্বদা সচেতন থেকেছে এবং আজও আছে।

১৯৪৯-এর ১২ জুলাই সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা ওঠে যাওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে দেশের সব রাজ্যে বাছাই করা কার্যকর্তাদের সামনে শ্রীগুরুজী তিন থেকে পাঁচটি ধারবাহিক বক্তব্য রাখেন। এ বিষয়ে তিনি বালাসাহেব খাপর্ডেকে লিখেছিলেন যে, 'এই প্রয়াস সঙ্ঘকার্যকে আবার লাইনে নিয়ে আসা।' এছাড়া দেশের জেলাস্তরের কার্যকর্তাদের জন্য পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত তিনটি অধিবেশন (সত্র)-এর আয়োজন করা হয়। এর প্রথমটি ছিল ১৯৫৪-র ৯ থেকে ১৬ মার্চ নাগপুরের কাছে সিন্দিতে। দ্বিতীয়টি ১৯৬০ সালের ৬ থেকে ১৩ মার্চ ইন্দোরে এবং তৃতীয়টি ১৯৭২ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর মুম্বইয়ের কাছে থানেতে।

১৯৪৯-এর ২৩ ডিসেম্বর প্রথম ধারাবাহিক ভাষণে শ্রীগুরুজীর প্রারম্ভিক কথা ছিল, 'দু'বছর আগে দিল্লির অনন্দপর্বতে এমনই এক সভায় আমরা নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কার্যকলাপের বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা এবং তাঁর রূপরেখার সম্পর্কে ভেবেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং আমাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো...।' এ থেকেই স্পষ্ট যে, স্বাধীনোত্তর ভারতে সঙ্ঘের নেতৃত্ব তাঁদের কার্যশৈলীর বিষয়ে চিন্তন শুরু করেছিল। প্রতিজ্ঞায় পরিবর্তন করা থেকেই নিঃসন্দেহে এর ঝলক পাওয়া যায়।

১৯৫৪ সালে সিন্দির চিন্তন বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলেন, 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যরত আমাদের কার্যকর্তারা রাজদূত অথবা ফিল্ডমার্শালের মতো। নিজেদের কুশলতা, বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের দ্বারা তাঁদের ওইসব ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতেই হবে এবং সঙ্ঘের আদর্শকে মূর্তরূপ দিতে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।'

১৯৬০ সালে ইন্দোরের চিন্তন শিবিরে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেন যে, এক সুসংগঠিত, অনুশাসিত গুণমানসম্পন্ন গতিশীল সমাজই আমাদের আদর্শ এবং এ কাজ করার জন্য সঙ্ঘ-শাখা এক উপযুক্ত মাধ্যম। এই বিচারে সঙ্ঘ সমাজে মজুত থাকা এক সংগঠনমাত্র নয়; বরং তা এক সুসংগঠিত সমাজের মূর্তরূপ। সঙ্ঘের শাখার মাধ্যমে কার্যকর্তা নির্মাণ এই দিশায় একটি পদক্ষেপ।

ধারবাহিক বক্তব্যের শেষ চরণে ১৯৭২ সালে থানে শিবিরে শ্রীগুরুজী জোর দিয়ে বলেন, ''আমাদের কাজের পরিধি সীমাহীন। সামাজিক কাজ বহুদিকে বিস্তার লাভ করেছে। এজন্য পরিশ্রমী ও দায়িত্ববান কার্যকর্তার চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এরকম কার্যকর্তাদের সঠিক ভাবে নিয়োজন করা সময়ের চাহিদা। সেজন্য এই সম্ভাবনাকে কার্যরূপে দেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় টোলি থাকা প্রয়োজন।''

চিন্তন শিবিরে তাঁর বক্তব্যে পুরো জোর থাকতো নিত্য শাখায় উপস্থিত থাকার বিষয়ে। যে-কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের তা পালন করার জন্য নিরন্তর শক্তি জোগাত। ফলস্বরূপ, সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে সঙ্ঘ-পোত নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেত।

প্রথম ভাগে সঙ্ঘ নারিকেল বৃক্ষের মতো এক-শাখি ছিল। কিন্তু তার বীজ ছিল বটবৃক্ষের মতো, যাতে বহু শাখা উৎপন্ন হওয়ার অপার ক্ষমতা লুক্কায়িত ছিল। সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসায় তার প্রথম সুযোগ আসে। সঙ্ঘের বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করা প্রত্যেক ব্যক্তি জানেন যে, সে সময় সব স্থানে ছাত্রসংগঠন শুরু হয়ে যায়। সম্ভবত এই কারণেই প্রতিবন্ধের সময় জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকে 'দুষ্টছাত্রদের ভিড়' বলে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন। অন্য একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন, 'মধ্যভারতে বুদ্ধিমান যুবকরা সঙ্ঘের সঙ্গে রয়েছে।' এজন্য প্রতিবন্ধের সময় আইনসঙ্গত ভাবে ছাত্ররা বহু স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে নিজের নিজের দল তৈরি করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি নামকরা সংগঠন পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যভারতে হয়েছিল। বালাসাহেব দেওরস এই সবগুলিকে একত্রিত করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গঠনের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এভাবেই ১৯৪৯ সালের ৯ জুলাই বিদ্যার্থী পরিষদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সঙ্ঘ আন্দোলনের বিধিবদ্ধ এটিই প্রথম সংগঠন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে একটি বিধিবদ্ধ সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল তা হলো দিল্লিস্থিত ভারত প্রকাশন। এখান থেকে সাপ্তাহিক অর্গানাইজার পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

এতদ্‌সত্ত্বে আজও সঙ্ঘ মনে করে একজন সত্যিকারের স্বয়ংসেবক নির্মাণ হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো সঙ্ঘের শাখা এবং কোনো সংবাদপত্র এর বিকল্প হতে পারে না। তথাপি প্রদেশের প্রমুখ কার্যকর্তারা অর্গানাইজার শুরু করেছিলেন— এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সঙ্ঘ নেতৃত্বের ভাবনা ছিল, 'স্বাধীনতা আগত প্রায়; কিছুদিনের মধ্যেই ভারত এক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ভারত সন্ততিরা স্বাধীন হবে, তাদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে প্রখর জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে এবং এর জন্য সমাচারপত্র এক প্রভাবশালী মাধ্যম হতে পারে।' এই ভাবনাতেই অর্গানাইজার শুরু করা হয়েছে। দেশের সব রাজ্যের কার্যকর্তাদের মধ্যে এই ভাবনা প্রবল হওয়ায় ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষায় সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা শুরু হয়ে যায়।

নাগপুরে নরকেশরী প্রকাশন ট্রাস্টের

মালিকানায় বালাসাহেব দেওরস এবং তাঁর বাছাই করা উৎকৃষ্ট স্বয়ংসেবকরা 'তরুণ ভারত' দৈনিক পত্রিকার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেন। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি এর প্রথম সংখ্যা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে কেরলেও 'রাষ্ট্রবার্তা' নামে দৈনিক পত্রিকা শুরু হয়। দিল্লি থেকে 'মাদারল্যান্ড' শুরু হয়েছিল কিন্তু ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় জোর করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হিন্দু মহাঅভিযানের দ্বিতীয় সাংগঠনিক স্বরূপ ভারতীয় জনসঙ্ঘ রূপে সামনে আসে। ভারত এক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রাপ্তবয়স্করা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়। তখন সঙ্ঘের ছত্রতলে লক্ষ লক্ষ যুবক একত্রিত হয়েছিল। তারা সবাই ভোটাধিকার প্রাপ্ত ছিল। সঙ্ঘ তাদের ওপর রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দায়িত্ব অর্পণ করে। অর্পিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অনুসারে তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথা। তখন একটি বড় প্রশ্ন উঠেছিল যে, ভোট কাকে দিতে হবে?

যাদের জন্য মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে তাদের ভোট দিতে হবে? উত্তর না। তবে কি দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের? উত্তর কখনই না। গণতন্ত্রে সংগঠিত চিন্তাভাবনাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকে উপেক্ষা করা সামাজিক পাপস্বরূপ। এইজন্য এক বিকল্প রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করাই একমাত্র পথ। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও এই দৃষ্টিতেই চিন্তাভাবনা করছিলেন। পরিণামস্বরূপ নাগপুরের সঙ্ঘচালক এম.এন. ঘটাটের বাড়িতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, শ্রীগুরুজী, বালাসাহেব দেওরস ও ভাউরাও দেওরসের মধ্যে এক বৈঠক হয়। গভীর চিন্তাভাবনা ও আলাপ আলোচনার পর জনসঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সহযোগিতা করার জন্য শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের প্রথম সারির অনুভবী কার্যকর্তা নানাজী দেশমুখ ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে এগিয়ে দেন। ভারতীয় জনসঙ্ঘ ভারতীয় বিচারধারায় ভারতে সৃষ্ট প্রথম রাজনৈতিক দল। এটি এক ইংরেজ রাজকর্মচারী অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম দ্বারা সৃষ্ট ইংরেজ শাসনকে পুষ্ট করা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে আলাদারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা ছিল যা কয়েকজন লোক রাশিয়ার স্বার্থে তাসখন্দের মাটিতে বসে গঠন করে এবং যারা ভারতকে 'দার-উল-হারব' বলে ভারত ত্যাগ করেছিল।

এর কিছুদিন পরেই শ্রমিক ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ নামে আর একটি সংগঠনের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পর, সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর অনুকূল পরিবেশে সঙ্ঘ নেতৃত্ব শ্রমিকক্ষেত্রে সংগঠন করার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে সুযোগ এসে গিয়েছিল। সংযোগবশত ১৯৫০ সালে ইনটাকের (আই এন টি ইউ সি) পি. ওয়াই দেশপাণ্ডে সঙ্ঘের প্রচারক দত্তোপন্ত ঠেংড়ীকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। বালাসাহেব দেওরস সময়োচিত ভাবনায় সানন্দে মত প্রদান করেন এবং ঠেংড়ীজী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক কুশল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতাই ১৯৫৫ সালের ২৩ জুলাই ভোপালে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়।

কলকারখানা থেকে বনজঙ্গলে যাত্রা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং তা অবিশ্বাস্যও বটে। কিন্তু নিজের শাখাপ্রশাকে বিস্তার করতে সংকল্পবদ্ধ সংগঠনের পক্ষে কোনো কিছু অসম্ভব নয়। এই ভাবনায় ১৯৫২ সালের ২৬ ডিসেম্বর বনবাসী-গিরিবাসীভাইদের কল্যাণের জন্য বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সৃষ্টি হয়। রমাকান্ত কেশব দেশপাণ্ডে মধ্য ভারতে বনবাসী ক্ষেত্রে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার রূপে সরকারি চাকুরি করতেন। কিন্তু ধর্মান্তরণকারী খ্রিস্টান মিশনারি এবং ভ্রষ্ট রাজনীতির শিকার হয়ে কর্মবীর কেশব দেশপাণ্ডেকে বহুবার বদলির অসুবিধা ভোগ করতে হয়। শ্রীগুরুজী তাঁকে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ওকালতি করতে পরামর্শ দেন যাতে তিনি নিজের লক্ষ্যের দিকে সহজভাবে এগিয়ে যেতে পারেন। তিনি সানন্দে এই পরামর্শ মেনে নেন এবং বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য শ্রীগুরুজী যুবক প্রচারক মোরেশ্বর কেতকরকে দেন। জয়পুরের রাজকুমার বিজয়ভূষণ সিংহ জুদেওয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় দু'জনে উৎসাহ সহকারে কাজ শুরু করেন।

গণসংগঠনকে সুশৃঙ্খল সংগঠনে রূপদানকারী শেষ সংগঠন হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এর জন্য দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সন্ন্যাসী ও ধর্মীয় নেতাদের একমঞ্চে আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। আর হিন্দুত্বের সঙ্গে যুক্ত করা আরও বেশি কঠিন ছিল। তথাপি স্বামী চিন্ময়ানন্দ, শ্রীগুরুজী এবং এম এস আপ্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয় এবং ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট জন্মাষ্টমীর পবিত্র তিথিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা হয়। এটি হিন্দুদের ইতিহাসে সত্যি সত্যিই এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় ছিল।

হিন্দুদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ছিল যে, সমুদ্রযাত্রা করলে ধর্মভ্রষ্ট হতে হয়। কিন্তু নবযুগের হিন্দু বলছে যে, বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করলে স্বয়ং হিন্দুধর্ম সুদৃঢ় হয়। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্জাবের জগদীশচন্দ্র সারদা শাস্ত্রী এস. এস. ওয়াসন জাহাজে মোম্বাসা যাচ্ছিলেন। জাহাজেই তাঁর সঙ্গে গুজরাটের মাণিকলাল রুঘানীর দেখা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই স্বয়ংসেবকের পরিচয় হয়। গল্পগুজবের পর জাহাজই তাঁরা সঙ্ঘের প্রার্থনা করেন। জাহাজে এভাবে দশদিন প্রার্থনা করতে করতেই ১৭ জনের একটি দল হয়ে যায়। এভাবেই বিদেশে সঙ্ঘকাজের সূচনা হয়। বস্তুত, সঙ্ঘকাজ এভাবে সমুদ্রপারে পৌঁছে যায়। কিছুদিন পরে কেনিয়াতে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়ে যায়।

পঞ্জাবের ডাঃ মঙ্গল সেন ১৯৫০-এ মায়ানমারে বসবাস শুরু করেন। স্বয়ংসেবক হিসেবে তিনিই সেখানে সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে চিন্তাভাবনার পর ব্রহ্মদেশে 'সনাতন ধর্ম স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' এবং কেনিয়ায় 'ভারতীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নাম রাখা হয়। এভাবেই সঙ্ঘের বিশ্ব বিভাগ শুরু হয়। রামপ্রকাশ ধীরকে প্রচারক হিসেবে ব্রহ্মদেশে পাঠানো হয়। ১৯৫৬ সালে শ্রীগুরুজীর ৫১তম জন্মদিবসে রেঙ্গুনে বর্মিভাষায় শ্রীগুরুজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ

করা হয়েছিল। শ্রীগুরুজীর কার্যকালে মোটামুটিভাবে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বাদে বাকি চার মহাদেশেই সঙ্ঘ পৌঁছে যায়।

এখানে মনে রাখার বিষয় হলো, বিদেশে সঙ্ঘশাখা শুরু করা সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল না। বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য যাওয়া সাধারণ স্বয়ংসেবকরা নিত্য শাখায় যুক্ত থাকার জন্য নিজেদের উদ্যোগেই শাখা শুরু করেন। সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্যই হলো একজন সাধারণ স্বয়ংসেবকও সঙ্ঘের বিকাশের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের মতোই দায়িত্ববান। সঙ্ঘ নেতৃত্ব খুশি মনেই এই নতুন দিক উন্মোচনকে স্বীকার করেন এবং দায়িত্ববান স্বয়ংসেবকদের প্রয়াসকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। এটা সেই প্রবাদবাক্যের মতো যে, গোবৎসের পিছনে পিছনে গাভীর ছুটে যাওয়া।

ওই প্রথম তিন দশক সময়ে স্বয়ংসেবকরা নিজ কার্যক্ষেত্রের প্রয়োজন পূর্তি হেতু বহু সংগঠনের সূত্রপাত করেন। এর মধ্যে একটি হলো ১৯৫২ সালে স্থাপিত গোরক্ষপুরে সরস্বতী শিশুমন্দির। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এর সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছে যায়। বর্তমানে বিদ্যাভারতী অনুমোদিত শিশুমন্দিরের কাজ সারা ভারতের সঙ্গে সঙ্গে নেপাল ও শ্রীলঙ্কায়ও পৌঁছে গিয়েছে। মেকলের ছড়ানো বিষ নষ্ট করার এ এক উপযুক্ত ওষুধ হিসেবে কাজ করছে।

দ্বিতীয় সংগঠন হলো অধুনা ছত্তিশগড়ে চাঁপা কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ। ভারতীয় রেল বিভাগে কর্মরত দায়িত্ববান স্বয়ংসেবক সদাশিব গোবিন্দ কাত্রে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তিনি এক খ্রিস্টান কুষ্ঠ নিবারক মিশনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি উপলব্ধি করলেন মিশনারিরা মানুষের সেবা করার চেয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করতে বেশি আগ্রহী। তিনি এর বিরোধিতা করে স্থানীয় মানুষদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। শ্রীগুরুজীর সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখন তাঁর মন অত্যন্ত অশান্ত ছিল। শ্রীগুরুজী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তুমি একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে এরকম ভাবছ না কেন যে, ভগবান তোমাকে এই রোগ এ জন্যই দিয়েছেন যাতে তুমি কুষ্ঠরোগীদের সেবা করার সুযোগ পাও।' তাঁর এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কাত্রেজী এক নতুন দিশা পেলেন। ফলস্বরূপ ১৯৬২ সালের ৫ মে কুষ্ঠ নিবারক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শেষদিন পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তিনি 'বাবাজী' নামে সম্মানিত হয়েছেন এবং এলাকাবাসী ওই স্থানের নাম 'কাত্রেনগর' রেখেছেন। বর্তমানে সারাদেশে এরকম ১০টি কেন্দ্র চলছে। কিন্তু এর ভিত্তি স্থাপন বাবাজী কাত্রের হাতেই হয়েছে।

অনেক সময় ব্যক্তির মতো সংগঠনও এমন কাজের দিকে আকর্ষিত হয় যা কখনো ভাবনাচিন্তাই করা হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে দায়িত্ববোধ ও ঘটনাক্রম একসঙ্গে যুক্ত হয়। সঙ্ঘেও এরকম হয়েছে। দেশ বিভাগের সময় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছনোর জন্য পঞ্জাব রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। সঙ্ঘ তখন থেকেই এরকম কাজকর্মে সবার আগে থেকেছে। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি গঠন করা হয়। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে যখন দেশ আনন্দ উৎসবে মুখরিত ছিল, তখন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে অসমরাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশের স্বয়ংসেবকরা পূর্বোত্তরের ভাইদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে। এই সময় থেকেই প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যনির্মিত দুর্যোগের সময় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছনোর কাজ সঙ্ঘের স্বভাবের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

যুদ্ধকালেও সঙ্ঘ এরকম ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের মাতৃভূমিকে ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯-এ চারবার পাকিস্তানের এবং ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট চীনের আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এইসব আক্রমণের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই ১৯৬৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র দিবসের দিন স্বয়ংসেবকদের প্যারেডে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকে ৬ মার্চের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বিষয়ক সর্বদলীয় বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। শ্রীগুরুজী ওই বৈঠকে নিমন্ত্রিত একমাত্র অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেই বৈঠকে শ্রীগুরুজী বামপন্থী নেতাদের বারবার 'আপনার সেনাবাহিনী' বাক্য সংশোধন করে 'আমাদের সেনাবাহিনী' বলার পরামর্শ দেন। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করার জন্য শ্রীগুরুজীকে আম্বালা থেকে বেতার ভাষণ দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি তা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৮ সালের নিষেধাজ্ঞা সঙ্ঘের ওপর গভীর আঘাতস্বরূপ ছিল। সঙ্ঘ ও তার প্রতিষ্ঠাকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টায় কংগ্রেস বহুলাংশে সফল হয়েছিল। তখন স্বয়ংসেবকদের এই অপমান অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে ভোগ করার ছিল এবং স্বয়ংসেবকরা তাই করেছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর এক বড় পরিবর্তন ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ এসে গেল যখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা গোহত্যা বিরোধী অভিযান শুরু করলেন। ২২ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর ৩২ দিন ধরে এই মহাযজ্ঞ চলেছিল। তাহলো গোহত্যাবিরোধীমনস্ক মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা। সেটা ছিল উপযুক্ত সমিতি দ্বারা উপযুক্ত উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ভূভাগে উপযুক্ত চিন্তাভাবনায় সাফল্যের দিকে উপযুক্ত পদক্ষেপ। সে সময় মোট ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৫২টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তা ছিল বিশ্বরেকর্ড। এই মহাঅভিযানে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে নিদ্রিত দেশ আবার জাগ্রত হয়ে পড়ল এবং স্বয়ংসেবকরা অনুভব করলেন যে, সমাজে এখন তাদের স্থান আগের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃঢ়।

চার বছর অতিক্রান্ত। সঙ্ঘ আরও এক পদক্ষেপ এগিয়ে যায়। এবারের আন্দোলন সরাসরি সঙ্ঘের আদর্শবাদ সম্পর্কিত। শ্রীগুরুজীর ৫১তম জন্মতিথি সঙ্ঘ অভূতপূর্ব রীতিতে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাহলো শ্রীগুরুজীর বিভিন্ন সময়ের ভাষণের ওপর তৈরি করা পুস্তিকা নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে সম্পর্ক স্থাপনের যোজনা। ১৯৫৬ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে ৮ মার্চ ৫১ দিন ধরে এই অভিযান চালানো হয়। এই প্রয়াসের ফলে যে বিশাল জনসমর্থন ও বিদ্বৎসমাজের

আশীর্বাদ পাওয়া যায় তাতে আবার একবার প্রমাণিত হয় যে সঙ্ঘ সঠিক দিশায় চলছে।

এর সাত বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে সঙ্ঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ পালন করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটা এক আদর্শবাদ প্রচারের অভিযান ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ভারতের শাশ্বত রূপের সঙ্গে পরিচিত করানো। প্রথমে স্বামীজীর স্মারক নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এজন্য একনাথ রানাডে স্বামীজীর বিভিন্ন সময়ে ভাষণের একটি সংকলন প্রকাশ করেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্বামী বিবেকানন্দস্ রাউজিং কল টু হিন্দু নেশন'। দু'শো পৃষ্ঠার এই ইংরেজি পুস্তক সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। খুব তাড়াতাড়ি ১ লক্ষেরও বেশি পুস্তক বিক্রি হয়ে যায়। দেশের কোণে কোণে স্বামীজীর জন্মশতাব্দী মহোৎসব আয়োজিত হয়েছিল।

কন্যাকুমারীতে বিবেকান্দ রক মেমোরিয়াল নির্মাণের সময় ঘটনাক্রমে সঙ্ঘকেই সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তার জন্য একনাথ রানাডের মতো কার্যকর্তাকে এই কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। স্বয়ংসেবকরা প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে ১ টাকা করে সংগ্রহ করে। সংগৃহীত অর্থ থেকে দানদাতা ব্যক্তির সংখ্যা পাওয়া যায়। এরকম ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটির বেশি ছিল। স্বাধীনতার পর নিঃসন্দেহে বহু মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা হয়েছিল কিন্তু এই স্মারক এজন্যই অভূতপূর্ব যে, সমুদ্রের ওপর এক বিশালাকার পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক নতুন মন্দির। বিংশ শতাব্দীতে এভাবে তৈরি এটি একমাত্র হিন্দুমন্দির।

সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞায় প্রারম্ভিক বাক্য হলো 'হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু সমাজের রক্ষা...'। এ থেকে পরিষ্কার যে, হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা সঙ্ঘের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা অনুভব করেছিলেন যে আমাদের সমাজ নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই উচ্চ-নীচ ভেদভাব থেকে মুক্ত ভ্রাতৃত্ববোধসম্পন্ন এক সংগঠিত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখেছিলেন। সঙ্ঘের পরিভাষায় একে 'সামাজিক সমরসতা' বলার রীতি। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার সময় থেকে এই দিশায় সাফল্য আসতে শুরু করে। ১৯৩৬ সালে ওয়ার্ধার শীত শিবিরে গান্ধীজী এসে সঙ্ঘের এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সঙ্ঘের বিবিধ ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। ১৯৬৯ সাল এই দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য। উডুপিতে আয়োজিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্মেলনে উপস্থিত সাধুসন্তরা একবাক্যে বলেন, 'হিন্দুবঃ সোদরা সর্বে ন হিন্দুঃ পতিতো ভবেৎ'। এরপর থেকে প্রত্যেক সম্মেলনে এই সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করা হয়। এটি আরও পরিষ্কার হলো ১৯৭৪ সালের ১৮ মে পুনায় আয়োজিত বসন্ত ব্যাখ্যানমালায়। পূজনীয় বালাসাহেব দেওরস ঘোষণা করলেন, 'যদি অস্পৃশ্যতা কোনো পাপ না হয়, তাহলে পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই।"

শুরু থেকেই সঙ্ঘ ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে। হিন্দু সমাজের প্রতি মমত্ববোধ সম্পন্ন যে-কোনো ব্যক্তি হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হতে দেখে চিন্তিত হবেন। স্বামী বিবেকান্দও দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, 'হিন্দু সমাজ থেকে কোনো ব্যক্তির অন্য ধর্মে চলে যাওয়া মানে একজন হিন্দুর সংখ্যাই কম হওয়া নয়; একজন শত্রু বৃদ্ধি হওয়া।' একনাথ রানাডে স্বামীজীর এই কথা তার সংকলনে প্রকাশ করেছেন। শ্রীগুরুজী এই প্রসঙ্গেই এক নতুন ভাবনা দিয়েছেন। ১৯৫৫ সালের ২৫ অক্টোবর সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রশক্তি' পত্রিকায় লিখেছেন, 'স্বাধীনতাকে যদি প্রাণবন্ত করতে হয় তাহলে যেসব হিন্দুবন্ধু ভয়ে লোভে খ্রিস্টান অথবা মুসলমানে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদের নিজের ধর্মে ফিরিয়ে এনে মূল সমাজের অঙ্গ করে নিতে হবে। তখনই পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যাবে।'

১৯৫৬ সালে শ্রীগুরুজী তাঁর সমস্ত ভাষণে পরিষ্কার করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে থাকার ফলে ধর্মান্তরিত বন্ধুদের যদি অন্য ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ় হয়ে থাকে অথবা সেই সমাজ ছেড়ে আসতে অস্বীকার করে তবু তাদের প্রতি হিন্দুদের রাগ করা উচিত হবে না। কেননা আমাদের প্রচুর দেব-দেবীর সঙ্গে আরও দুটো দেবতা যুক্ত হয়ে যাবে। তাদের কাছে শুধু এটুকু আশা রাখতে হবে যেন তারা তাঁদের মূল সাংস্কৃতিক পরিচয় ভুলে না যান এবং নিজেদের পর না ভাবেন।' এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নিশ্চিত ভাবে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। শ্রীগুরুজী পুরো এক দশক এই ভাবনাকেই সঞ্জীবিত করেছেন। যার ফলে ১৯৬৬ সালে কুম্ভমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বৈঠকে বিভিন্ন মত-পথের ধর্মাচার্যরা সম্মিলিত ভাবে তা স্বীকার করেন। অতপর হিন্দু সমাজ তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পুত্রদের গ্রহণ করতে তৈরি হয়ে যায়।

দ্বিতীয় চরণের তৃতীয় দশক রাজনৈতিক দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ এবং সাংগঠনিক দৃষ্টিতে সতর্কবাণী স্বরূপ ছিল। একদিকে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান, অন্য দিকে সমস্ত ক্ষেত্রে সঙ্ঘের দৃঢ় পদক্ষেপে জয়যাত্রা। এর মধ্যে শ্রীগুরুজী দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং রোগের সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই তাঁর দেহাবসান হয়। এরপর বালাসাহেব দেওরস সরসঙ্ঘচালক হন। কংগ্রেসের জারি করা জরুরি অবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ হয়। সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করার কারণ হলো কংগ্রেস সঙ্ঘের জয়যাত্রাকে সহ্য করতে পারছিল না। সঙ্ঘ তাদের চোখের বালি হয়ে গিয়েছিল। দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের এটা সবচেয়ে সঠিক সময় ছিল। সঠিক অর্থেই এটি দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল। তাই সঙ্ঘ ও রাষ্ট্র বিজয়ী হয়েছিল। সঙ্ঘ তখন নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে নতুন পরিবেশে বিজয়পতাকা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে এবং গৈরিক ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হতে শুরু করে।

সঙ্ঘের দ্বিতীয় চরণের এটিই সংক্ষিপ্ত কাহিনি। যদি প্রথম চরণে সঙ্ঘ এক 'সংস্থা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় চরণে তা এক 'আন্দোলন' রূপে ফলেফুলে বিকশিত হয়। প্রথম চরণে সেই সংস্থাকে যদি লালনপালন করে শক্তি সম্পন্ন করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় চরণে আমাদের নানা ভাষা নানা মতের সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সময় ছিল। দাদারাও পরমার্থ বলেছিলেন, 'সঙ্ঘস্থানই হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানই সঙ্ঘস্থান।' সঙ্ঘের প্রথম চরণ দাদারাওয়ের কথাকেই চরিতার্থ করে এবং দ্বিতীয় চরণ তাঁর কথার দ্বিতীয় ভাগের মর্মার্থস্বরূপ।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ)

ত্রিপুরায় সঙ্ঘ
গণেশদা থেকে গুরুদা

অভিমন্যু রায়

শীর্ণকায় মাঝারি গড়ন, পুরু লেন্সের চশমা, ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এক ভদ্রলোক এসে নামলেন গাড়ি থেকে। তখন আগরতলায় কতই বা লোকজন। শুনশান পথঘাট। পদচারীদেরই পথ। মাঝে-সাজে রিক্সা, একটি দুটি গাড়ি। ভদ্রলোক ঠিকানা নিয়ে এসেছেন। খুঁজে খুঁজে সে ঠিকানায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নমস্কার! আমি গণেশ দেবশর্মা। কলকাতা থেকে আসছি।

সেই গণেশ দেবশর্মার (পরবর্তীকালে সবার গণেশদা) ত্রিপুরায় আসা। ত্রিপুরায় সঙ্ঘ ভগীরথ হয়ে আসা। তাঁর আগমনের পূর্বে দু-চার জন সঙ্ঘের কেবল নামই শুনেছে। তিনি এলেন, দেখলেন, ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা শুরু করলেন। মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদধন্য ত্রিপুরার আকাশ বাতাসে সর্বপ্রথম গুঞ্জরিত হলো— 'নমস্তে সদাবৎসলে মাতৃভূমে, ত্বয়া হিন্দুভুমে সুখং বর্ধিতোহহম্'।

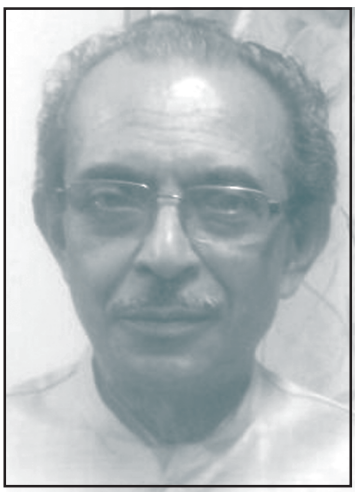

গুরুপদ ভৌমিক

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ছিলেন পাশ করা ডাক্তার। সমাজদেহের চিকিৎসার যে আবিষ্কার তিনি করেছিলেন তা মূলত ছিল এক দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। স্বল্পমেয়াদে লাভ- ক্ষতির কোনো ধারণা সে উদ্যোগে ছিল না। সঙ্ঘকে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উপায় হিসেবে দেখতে চাননি। স্বামীজীর স্বপ্নের একশো যুবক নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। শাখা নামক একটি নৈমিত্তিক অথচ খুব সাধারণ ঘষা-মাজার একটি পদ্ধতির জন্ম দেন তিনি। এই শাখার মাঠে তিনি দেখতে চাইতেন পাড়ার ভাল ছেলেদের এবং স্কুলের ভাল ছাত্রদের। এক যুবক বাহিনী তিনি চাইতেন যারা আধমরা হিন্দুসমাজকে ঘা মেরে বাঁচাবার লক্ষ্যে সর্বস্ব পণ করবে। আরও অনেকের মতো গণেশদা ছিলেন সেই বাহিনীরই একজন।

গণেশদা আগরতলায় এসেছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। অকল্পনীয়। সদ্য দেশভাগ হয়েছে। ইসলামি চোখ রাঙানিতে বহু মানুষ ভারতে উঠে আসছেন সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে। ত্রিপুরার আনাচে-কানাচে নয়া বসত সৃষ্টি হচ্ছে। সেসব জনপদের প্রাথমিক চাহিদা মাথার উপর ছাউনি, আর পেটে দু-মুঠো ভাত। রাষ্ট্রগঠনের আহ্বান তাদের কাছে কিছু অর্থহীন শব্দশৃঙ্খল বই আর কিছু নয়। এই পটভূমিতে গণেশদা কাজ শুরু করলেন। গণেশদা জানতেন তাঁর কাজ এক দীর্ঘমেয়াদের কাজ। এ কাজ সমাজ গঠনের। যে কোনও ভাঙার কাজে দ্রুত সফলতা আসে। গঠন এক লম্বা সময়াবধির নীরব সাধনার কাজ। তাঁকে ত্রিপুরায় সঙ্ঘ কাজের ভিত্তি স্থাপন করে যেতে হবে।

• • • • • • • • • • •

১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট। ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনছড়ার কল্যাণ আশ্রম থেকে অপরহণ করা হয় সঙ্ঘের চার বরিষ্ঠ কার্যকর্তাকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র কার্যবাহ শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, দক্ষিণ অসম শারীরিক প্রমুখ ও প্রচারক দীনেন্দ্রনাথ দে, আগরতলা বিভাগ প্রচারক সুধাময় দত্ত এবং ধর্মনগর জেলা প্রচারক শুভঙ্কর চক্রবর্তী। খ্রিস্টান জঙ্গি সংস্থা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এন এল এফ টি)-র দিকে আঙুল ওঠে এই অপহরণ কাণ্ডে। ২০০১ সালের ২৭ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্মসচিব এঁদের বাড়িতে চিঠি দিয়ে অপহরণকারীর দ্বারা ওই চারজনের হত্যার খবর নিশ্চিত করে।

শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত। জন্ম বাংলাদেশের সিলেটে (১৯৩২)। পাঁচ ভাই, দুই বোন। ছোটবেলা থেকে স্বয়ংসেবক। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম কম। কর্মজীবনে জীবনবিমা সংস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। পিতা - সুশীলচন্দ্র সেনগুপ্ত।

• • • • • • • • • • •

গণেশদা এসেই আগরতলার সুধী সজ্জনদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে নেমে পড়লেন। তিনি প্রথমে তৎকালীন আগরতলার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, শচীন দত্ত, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, তড়িৎ দাশগুপ্তদের সঙ্গে পরিচয় করে নিলেন। শাখা খোলার লক্ষ্যে পরিচিত অপরিচিত মানুষজনের বাড়ি যেতে শুরু করলেন। বন্ধুত্ব করতে শুরু করলেন বিশেষ করে বালক ও তরুণদের সঙ্গে। বিকেলে কিশোর তরুণদের সঙ্গে খেলার মাঠে যেতে শুরু করলেন। সেই খেলার সূত্র ধরেই ১৯৫০ সালে বিজয় কুমার স্কুলের মাঠে সঙ্ঘের শাখা প্রথম শুরু হলো। গণেশদা আগরতলায় মোটামুটি সাড়ে তিন বছর মতো ছিলেন। তাঁর সময়কালেই আগরতলায় সাতটি শাখা চালু হয়ে গিয়েছিল। গণেশদার সম্পর্কে এসে স্বয়ংসেবক হওয়াদের মধ্যে ছিলেন সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সম্পাদক), নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন সরকার, প্রশান্ত দত্ত, হিরণ্ময় মজুমদার, কৃষ্ণবন্ধু দেবনাথ, অজিত চক্রবর্তী, পীযূষ ভট্টাচার্য, দুলাল চক্রবর্তী, পরিমল ভট্টাচার্য, কাজল রায়বর্মণ, জয়দেব চক্রবর্তী, কামনা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন দেবনাথ, হরিপদ ভৌমিক, অবনী দাস, শ্যামাপদ দত্ত প্রমুখ।

গণেশ দেবনাথ শর্মা

ত্রিপুরার প্রথমদিকের এই স্বয়ংসেবকদের অনেকেই আজ প্রয়াত। তবে তাৎপর্যপূর্ণ এই যে যারা চলে গেছেন তাদের প্রত্যেকেই আমৃত্যু সঙ্ঘ কাজের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা এখনো কোনো না কোনো ভাবে সঙ্ঘ কাজে নিজেদের অবদান রেখে যাচ্ছেন। গণেশদা তাঁর কুশলী ব্যক্তিত্বে স্বল্পসময়ে আগরতলায় সঙ্ঘকার্য এমন দাঁড় করান যে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর আগরতলায় প্রবাস হয়। সে সময়কার জমজমাট মেলারমাঠ শাখায় শ্রীগুরুজীর আগমন উপলক্ষে কার্যক্রম হয়। তরুণ স্বয়ংসেবক কামনা চক্রবর্তী সে অনুষ্ঠানের মুখ্যশিক্ষক ছিলেন।

গণেশদার সময় প্রথম সঙ্ঘ কার্যালয় হয় শঙ্কর চৌমুহনীর নিকট চিত্ত বর্মণের বাড়িতে। কিছুদিন পর তা স্থানান্তরিত হয় কামান চৌমুহনীতে। বর্তমান ব্যাঙ্ক অব বরোদার উত্তরে দোতলায় ছোট ছোট দুটি কামরায় ছিল তখনকার কার্যালয়। নাম দেওয়া হয়েছিল বিবেক বিতান। দু' সেট ধুতি-পাঞ্জাবি, দু-তিনটে বাসন, একটি ইকমিক কুকার, একটি সাইকেল— এই ছিল গণেশদার সঙ্ঘ স্থাপনার সাধন। দুপুর ও রাত্রির ক্ষুন্নিবৃত্তি হতো পালাক্রমে স্থির করা স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে। কিছু ঠিক না থাকলে ইকমিক কুকারে সেদ্ধ ভাত। এই খেয়েই সাইকেলে পুরো আগরতলা চষে বেড়াতেন তিনি। ১৯৫৪ সালে গণেশদার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হলে তিনি গৌহাটির উদ্দেশে রাজ্য ত্যাগ করেন।

সঙ্ঘের ভিত্তিভূমি স্থাপন করে গণেশদার প্রস্থানের পর ১৯৫৫ সালে রাজ্যে প্রচারক হয়ে এলেন সন্তোষ নন্দী। খর্বকায়, সুগঠিত শরীরের অধিকারী সন্তোষদা ভালো কবাডি খেলতেন। আর গাইতেন গান। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমধুর। অল্প দিনেই সন্তোষদা আগরতলায় সুপরিচিত হয়ে উঠলেন তাঁর গানের সুবাদে। সঙ্ঘের সম্পর্ক বাড়ানোর পদ্ধতি হলো নিত্যনতুন মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় করা এবং পরিচিত হওয়া। সন্তোষদা গানের সূত্রেই আগরতলার বহু বাড়িতে সঙ্ঘ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি ১৯৬৩ পর্যন্ত আগরতলায় ছিলেন। তাঁর সময়ে উজান অভয়নগর, রামনগর, জয়নগর প্রভৃতি এলাকার শাখা শুরু হয়। সঙ্ঘ পৌঁছে যায় উদয়পুরেও। সমীর চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবার সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের আঁচ রাজ্যেও এসে পড়ে। স্বয়ংসেবকরা উদ্বিগ্ন হন। মানুষের মধ্যে চীন বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে। এই অবস্থায় স্বয়ংসেবকেরা খবর পান বামপন্থীরা চীনের সমর্থনে মাঠে নেমে পড়েছে। এদিক ওদিকে পথসভা করে প্রচার করছে চীন নয় আসলে

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

সুধাময় দত্ত। জন্ম মেদিনীপুর শহরে। ছয় ভাই। কলেজে পড়ার সময় থেকেই স্বয়ংসেবক। স্নাতক হওয়ার পর প্রচারক জীবন শুরু। পিতা- ঁসতীরঞ্জন দত্ত।

দীনেন দে। জন্ম কলকাতার উল্টোডাঙ্গায়, ২৮ জুলাই ১৯৫৩। দুই ভাই ও দুই বোন। বাল্যকাল থেকেই স্বয়ংসেবক। স্নাতক হওয়ার পর প্রচারক জীবন শুরু। ঁপিতা- দেবেন্দ্রনাথ দে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী। জন্ম দঃ ২৪ পরগণার শেওরদহ-তে, ১৯৬১ সালে। ৫ ভাই, ২ বোন। স্নাতক। কলেজে পড়ার সময় সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। পিতা -ঁঅমূল্যধন চক্রবর্তী।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছে। স্বয়ংসেবকরা ভাবলেন কিছু একটা করা দরকার। সত্যদা, দুলালদা, পীযুষদারা তখন নবযুবক। খবর এল ভারত বিরোধী প্রচারের লক্ষ্যে বামপন্থীরা শিশুউদ্যানে সভা করে ভুল বোঝাচ্ছেন মানুষকে। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের নামে অপবাদ স্বয়ংসেবকদের সহ্য হলো না। তারা রে রে করে তেড়ে গেল সভা মঞ্চের দিকে। মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা। আগুন ঝরানো বক্তৃতাবাজরা দৌড়ে পালিয়ে গেল মঞ্চের পেছন দিকে থেকে।

আগরতলায় সঙ্ঘশাখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছিল। তখনকার কংগ্রেসি সরকারের পক্ষে বিষয়টা সুখকর বলে মনে হচ্ছিল না। সরকার আদেশ জারি করল— কোনও সরকারি কর্মচারী সঙ্ঘ কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারবেন না। সঙ্ঘ যাদের বুকের বাতাস তাদের কি আর সার্কুলারে আটকানো যায়? সরকারি কাজও চলে, সঙ্গে সঙ্ঘও। সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়ে। সরকারের কোপে রুল ৫-এ চাকুরি যায় সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী এবং চিত্তরঞ্জন সরকারের। নিজে অকৃতদার, কিন্তু মা ভাইদের নিয়ে বড় সংসারের বোঝা কাঁধে নিয়ে বড়ভাই সত্যদা বটতলায় ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের কাজে যোগ দেন। আইনি লড়াই করে চিত্তদা চাকুরি ফেরত পান।

১৯৬৩ সনে সন্তোষদার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। তারপর থেকে চার বছর ত্রিপুরায় কোনও প্রচারক ছিল না। ততদিনে যুবক ও প্রবীণ স্বয়ংসেবক নৃপেন রায়, পীযূষ ভট্টাচার্য, দুলাল চক্রবর্তী, সন্তোষ দাস, শুধাংশু চক্রবর্তী নিজেদের উদ্যোগে শাখাগুলিকে চালু রাখেন। ১৯৬৩ সালেই স্বয়ংসেবক সুজিত চক্রবর্তী (কাজল) বসত পাল্টে কলকাতা থেকে আগরতলা পাকাপাকি চলে আসেন। সুজিতদা রাজবাড়ির উত্তর গেটে সিমেন্ট ফিল্টার, পিলার ইত্যাদির একটা নির্মাণ ও বিক্রয় কেন্দ্র শুরু করেন। তাঁর উদ্যোগেই কর্নেল বাড়িতে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়। সেই শাখার স্বয়ংসেবক হরিকিশোর দেববর্মা দ্বিতীয়বর্ষ সংঘশিক্ষাবর্গ সম্পন্ন করেন।

১৯৬৭ সালে সুদর্শন মারাঠি যুবক শ্রীধর আন্না পাঠক প্রচারক হয়ে আসেন আগরতলায়। পাঠকজী নামে তিনি সর্বত্র পরিচিত হন। শাখায় খেলকুদ বিশেষ করে কবাডির তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট খেলোয়াড়। দেখতে দেখতে তরুণ ও যুবক স্বয়ংসেবকদের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। পাঠকজী কখন শাখায় আসবেন স্বয়ংসেবকরা তার পথ দেখত। ১৯৭০ সালে আগরতলায় প্রচারক হয়ে আসেন সৌম্যেন্দু শেখর ভট্টাচার্য ওরফে ঝুনুদা। ব্যবহার কুশল ঝুনুদা অচিরেই স্বয়ংসেবকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। তাঁর সময় রামপুর তুলার মাঠে সঙ্ঘের শাখা একটি আদর্শ শাখায় পরিণত হয়। সে শাখায় একঝাঁক তরুণ সঙ্ঘের আদর্শে চলার মন্ত্র গ্রহণ করেন। দীপক দেব, অসিত ঘোষ (বিষ্ণু), বিকাশ দেবনাথ, প্রদীপ তলাপাত্র তাদের অন্যতম।

১৯৭১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বছর। সে বছর ডিসেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আগরতলার পথ দিয়ে বহু সৈন্য আখাউরা ও অন্যান্য রণাঙ্গনে যায়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যুদ্ধে যাওয়া সৈন্যদের মধ্যে শুকনো খাবার, ফলমূল বিতরণ করার ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধারাও সঙ্ঘের এই সেবাকাজ থেকে বাদ যায় না।

১৯৭২-৭৫ সাল ত্রিপুরা প্রচারকবিহীন থাকে। সে সময় স্বয়ংসেবকরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে শাখাগুলিকে জীবন্ত রাখেন। ১৯৭৫-এ জারি হয় জরুরি অবস্থা। সঙ্ঘের উপর নেমে আসে নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া। প্রকাশ্যে সঙ্ঘের কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আগরতলা সঙ্ঘ কার্যালয়ে পুলিশ আসার আশঙ্কায় দীপকদা, সুজিতদা ও অন্য স্বয়ংসবকেরা কার্যালয়ের সমস্ত মালপত্র দু-ভাগ করে একভাগ বেলতলির সত্যদার বাড়িতে, অপর ভাগ গোপনে একটি ঘর ভাড়া করে রেখে আসেন। সেইসময় গুয়াহাটি পানবাজার সঙ্ঘ কার্যালয়ে খোঁজ খবর করতে গিয়ে পীযূষ ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হন। প্রায় তেরো মাস কারান্তরালে থাকার পর তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। সমগ্র দেশে লক্ষাধিক স্বয়ংসেবককে জরুরি অবস্থায় কারারুদ্ধ করা হয়। যে স্বয়ংসেবকরা গ্রেপ্তার হননি তারা গোপনে মিলিত হয়ে সঙ্ঘকাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। সঙ্ঘকাজ বলতে তখন ছিল সঙ্ঘ-সম্পর্কিত সংবাদ আদান প্রদান ও জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গঠন। গোপনে প্রচারপত্র লেখা, ছাপানো ও স্বয়ংসেবকদের কাছে পৌঁছানোর কাজে রত ছিলেন দীপক দেব, মিহির দেব (প্রয়াত), সত্যদা, অমূল্য রতন পাল প্রমুখ।

১৯৭৮ সালে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। সঙ্ঘের উপর থেকে বিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। আবার শাখায় শাখায় স্বয়ংসেবকদের সমাগমে প্রভাত ও সায়ংকাল মুখরিত হতে থাকে। সেইসময় ২৩ মাস কারান্তরালে থাকা অধিবক্তা তিন্নুকিয়ার গুরুপদ ভৌমিক ত্রিপুরার বিভাগ প্রচারক হয়ে আসেন। তাঁর কুশলী পরিচালনায় সঙ্ঘ কাজ উদয়পুর থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রসারিত হতে থাকে। সেই সময় বিদুরকর্তা চৌমুহনির পশ্চিমে বাদুরতলি রাস্তার মুখে অন্নদা ভবনে সঙ্ঘকার্যালয় ছিল। ১৯৮১-র শুরুতে সেই কার্যালয় রাজবাড়ি পরিসরে অমরেশ নন্দী মজুমদারের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৭৯ সালের শুরুতে ত্রিপুরায় সরসঙ্ঘচালক শ্রীবালাসাহেব দেওরসজীর কার্যক্রম হয়। শিশুউদ্যানের রবীন্দ্র ভবন লাগোয়া অংশে সে অনুষ্ঠান হয়েছিল। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরা ভয়াবহ দাঙ্গার কবলে পড়ে। স্বয়ংসেবকরা সেসময় ত্রাণ শিবিরে ঘুরে ঘুরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ জনের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। ১৯৭৯ সালে তৈদুতে কল্যাণ আশ্রম শুরু হয়। ১৯৮০-র দাঙ্গার সময় দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের মানুষজন কল্যাণ আশ্রমে পাশাপাশি অবস্থান করে জাতি-জনজাতি ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করেন। ১৯৮০-র দাঙ্গায় ত্রিপুরার সামাজিক অবস্থার বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা জাতি-জনজাতির মধ্যেকার ফাটল দূরীকরণে আগাগোড়াই সচেষ্ট ছিলেন।

গুরুপদ ভৌমিক ১৯৮১ সালে গুয়াহাটি ফিরে গেলে কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরা বিভাগ প্রচারকহীন অবস্থায় থাকে। সেই সময় শ্রী নির্মলেন্দু দে আগরতলা নগর প্রচারক হয়ে আসেন। তখন আগরতলায় ৮/৯টি শাখা ভালভাবেই চলতো।

১৯৮৩ সালে বিভাগ প্রচারক রূপে মহারাষ্ট্রের রামচন্দ্র সহস্রভোজনী আগরতলা আসেন। তারপর শুরু হয় সঙ্ঘের আরেক অধ্যায়। সে অধ্যায়ের কথা অন্য পরিসরে। ■

ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশ

সৌরিশ দেববর্মন

ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে রাজন্যশাসিত দেশ হিসেবে জাপানের পরই ত্রিপুরার স্থান। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন— ''ভারতবর্ষে বর্তমানকালে যত রাজ্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম আর কোনো বংশে একাধারে পাই না। এই বংশের আদিপুরুষ দ্রুহ্য কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ নগরী স্থাপন করেন।'' পৌরাণিক রাজা যযাতি পুত্র দ্রুহ্য যেহেতু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং অনেকে এই রাজবংশকে দ্রুহ্যবংশও বলে থাকেন। আবার দ্রুহ্য যেহেতু গুরুবংশের জ্ঞাতি (যযাতির পাঁচ পুত্র— যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য, অনু ও পুরু), সুতরাং দ্রুহ্যবংশীয় ত্রিপুররাজগণও চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডবদের জ্ঞাতি এবং আবহমানকাল ধরে ত্রিপুরার রাজগণ চন্দ্রবংশজ বলেই খ্যাত। ত্রিপুরার বিভিন্ন কালের সনদে আবহমানকাল ধরে রাজধানীর নাম 'হস্তিনাপুরী' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

হস্তিনাপুরী কুরু-পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল। মাণিক্য রাজাদের রাজধানীর নাম অন্য হলেও কুরু-পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই হয়তো আভিজাত্যের বা শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে মাণিক্যরা এই পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারেন। ত্রিপুরার রাজবংশ অর্থাৎ মাণিক্য রাজবংশের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো হলো রাজাবলী (গদ্য সাহিত্য), সংস্কৃত পদ্য সাহিত্য— রাজরত্নাকরম এবং রাজমালা তথা বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম পদ্য সাহিত্য বাংলা 'রাজমালা'। এর মধ্যে বর্তমানকালে সংস্কৃত রাজরত্নাকরম ও রাজমালাই সহজলভ্য। রাজমালা বা রাজরত্নাকরম হলো মাণিক্য রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাস। রাজমালা অনুসারে মধ্যযুগের প্রথমদিকে এই

চাকমা

ত্রিপুরায় বসবাসকারী জনজাতিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো চাকমা। চাকমা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শক্তিমান থেকে। বর্মার রাজারা চাকমাদের মন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং অনুবাদকের পদে নিয়োগ করতেন। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির অনুবাদ করা তাদের অন্যতম প্রধান পেশা। বর্তমান মায়ানমারে এখনও তারা শক বা থিত্ নামে পরিচিত, যা শক্তিমান শব্দের অপভ্রংশ। চাকমাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী রয়েছে— (১) অ্যানোকিয়া, (২) তানদুজিয়া, (৩) মঙ্গলা।

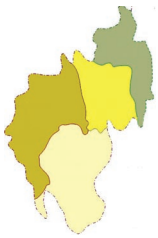

বংশের রাজা রত্ন ফা প্রথম মাণিক্য উপাধি ধারণ করেন এবং পরবর্তী রাজগণ এই ধারা বজায় রাখেন। কিন্তু মুদ্রাসাক্ষ্য ও লিপিতত্ত্ব অনুসারে ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করেছেন যে রত্নমাণিক্য নন মহামাণিক্য (১৪০০ খ্রি.) ওরফে কীর্তিধর ওরফে জেংথুমফা প্রথম মাণিক্য উপাধিধারী মাণিক্য রাজা। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মাণিক্য রাজবংশ পূর্ব ভারতে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানার একটি চিত্র পাওয়া যায়। রাজা ধর্ম মাণিক্যের (১৪৩১ খ্রি.—১৪৬২ খ্রি.) রাজত্বকালে রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে তৈয়ঙ্গনদী বা অসমের দিয়ঙ্গনদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ বা আরাকান, পূর্বে মেঘলী রাজ্য বা মণিপুর এবং পশ্চিমে কাচবঙ্গ বা কোচরাজ্য ও বঙ্গদেশ। মাণিক্যদের বিচক্ষণতায় ও বুদ্ধিমত্তায় ত্রিপুরা এক শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যযুগের পরাক্রমশালী মাণিক্য শাসকদের মধ্যে ছিলেন মহারানি ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী, মহারাজ ধর্মমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, অমর মাণিক্য, রাজধর মাণিক্য (প্রথম), যশোধর মাণিক্য, কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য, কৃষ্ণমাণিক্য। আর আধুনিক যুগের অতুলনীয় গুণী রাজারা হলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য এবং সর্বশেষ সার্বভৌম নৃপতি মহারাজা স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর। সর্বগুণে গুণান্বিত সর্বশেষ এই চারপুরুষ রাজার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল অনিন্দ্যসুন্দর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ভারতে যখন একের পর এক বিদেশি আক্রমণে সনাতনপন্থীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মাণিক্য রাজারা। আফগান তুর্কি সুলতানি শাসকদের অসংখ্যবার যুদ্ধে পরাজিত করেছিল ত্রিপুরার বীর সেনারা। সংস্কৃত রাজমালা ১২৪০ খ্রি. দিল্লির সুলতানের সঙ্গে ত্রিপুরার যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করেছে। সেই ভীষণযুদ্ধে মহারানি ত্রিপুরাসুন্দরীর নেতৃত্বে সুলতানি শক্তিকে পরাজিত করেছিল ত্রিপুরাবাহিনী। ভারতীয় মহিলাকুলের মধ্যে এইরকম যুদ্ধবিজয়ী বীরাঙ্গনা নারীর কথা খুব একটা শোনা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে রাজর্ষি ধর্মমাণিক্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ত্রিপুরার রাজবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করান পয়ার ছন্দে। ঐতিহাসিক জেমস্ লঙ ১৮৫১ খ্রি. এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিবেদনে বাংলা রাজমালাকে বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হলো রাজমালা। যদিও পরবর্তীকালে অনেকেই নানা অজুহাতে লঙ সাহেবের মতটি গ্রহণ করতে চাননি। তবে রাজমালার গুরুত্ব ও প্রাচীনত্বের নিরিখে পক্ষে বিপক্ষে দুটি মতই বিদ্যমান।

মধ্যযুগের অত্যন্ত শৌর্যশালী মাণিক্য রাজা (১৪৯০-১৫১৫ খ্রি.) ধন্য মাণিক্য সেদিন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত করে মুসলমান আগ্রাসনকে মেঘনার পশ্চিমপাড় অব্দিই আটকে দিয়েছিলেন। ধন্য মাণিক্যের নেতৃত্বে সেদিন চট্টগ্রাম অব্দি ত্রিপুরার বিজয়কেতন উড়েছিল। রাজা ধন্য মাণিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে একান্নপীঠের এক পীঠ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করান ১৫০১ খ্রি. ত্রিপুরার উদয়পুরে। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবিস্তারই মাণিক্যদের উদ্দেশ্য ছিল না। মধ্যযুগে জনকল্যাণমূলক একাধিক কাজের নিদর্শন রেখে গেছেন মাণিক্যরা। জনসাধারণের মঙ্গলার্থে অসংখ্য হ্রদ বা দিঘির নির্মাণ করান। এছাড়া অসংখ্য দেবালয় নির্মাণে এদের ধর্মপরায়ণতার পরিচয় মেলে। সেদিন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব— তিন মতেরই সমান সমাদর ছিল ত্রিপুরায়। মহারাজ ধন্যের যোগ্য পৌত্র বিজয় মাণিক্যও পিতামহের নগর ত্রিপুরার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। মুঘল বাদশাহ আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখেছেন— ''ভাটী প্রদেশের সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে। তার নাম ত্রিপুরা। এই রাজ্যের অধিপতির নাম বিজয় মাণিক (মাণিক্য)। এই রাজার দুই লক্ষ পদাতিক ও এক সহস্র হাতি আছে, কিন্তু অশ্ব বিরল।''

মুঘলদের এই বিবরণ থেকেই স্পষ্ট যে, মধ্যযুগে মাণিক্যরা একটি গণনীয় শক্তির মধ্যে

কমলসাগর কালীমন্দির

কসবার কমলসাগর কালীমন্দিরকে অনেকে কসবা কালীবাড়িও বলে থাকেন। জায়গাটা আগরতলা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে। মন্দিরের পাশেই কমলসাগর। বাংলাদেশের সীমানা-ঘেঁষা কমলসাগরে অনেকে পিকনিক করতে আসেন। কমলাসাগর কালীমন্দিরে রয়েছে দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। বেলে পাথরে তৈরি বিগ্রহ মহাকালী হিসেবে পূজিত হন। মূর্তির পায়ের কাছে শিবলিঙ্গের অবস্থান দেবীর এই রূপান্তর তত্ত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে।

পরিগণিত ছিল। এর থেকেই মাণিক্যদের শৌর্য বীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘলরা কোনও সময়েই ত্রিপুরাকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করতে পারেনি। বিজয় মাণিক্যের (দ্বিতীয়) শাসনেই ত্রিপুরার সীমা সবচাইতে বেশি পরিবর্ধিত হয়েছিল, পশ্চিম দিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত। মাণিক্যদের নেতৃত্বে সেদিন ত্রিপুরার একমাত্র বাণী ছিল 'কিল বিদুর্বীরতং সারমেকং'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দেশীয় রাজ্য প্রবন্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে অঙ্কিত 'কিল বীদুর্বীরতাং সারমেকং' সম্পর্কে বলেছেন যে— 'এই বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিব, এই বীর্য্যের দারিদ্র্যবশতই দেশ পিছিয়ে পড়ে, বিদেশের অনুকৃতি তাকে সার্থক করে তুলতে পারে না। পরবর্তীকালে যশো মাণিক্য বীরত্বের সঙ্গে মুঘলদের প্রতিহত করার চেষ্টায় যুদ্ধ বন্দি হন ও শাহজাহানের দরবারে দিল্লিতে প্রেরিত হন। সম্রাট শাহজাহান তাকে মুক্তি দিতে চাইলে, যশো মাণিক্য অপমানে রাজ্যে পদার্পণ করতে চাইলেন না ও খুব করুণ অবস্থায় সপরিবারে বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। যশো মাণিক্যের পর কল্যাণ মাণিক্যের শাসনে মুঘলরা দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণে ব্যর্থ হন। সেদিন কল্যাণ মাণিক্যের শাসনে বিখ্যাত তুলাদান অনুষ্ঠানে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করতে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মধ্যযুগে মাণিক্যেরা সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার সমান্তরাল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুদূর নেপাল ও মিথিলা থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সঙ্গীতজ্ঞরা ত্রিপুরায় হাজির হয়েছিলেন। মহামাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অহমিয়া রামায়ণ রচিত হয়েছিল। নেপালে বিদ্যাপতির একটি প্রাচীন পুথিঁতে ধন্য মাণিক্যের উল্লেখ আছে। ড. সুকুমার সেনের মতে বাংলায় লেখা ব্রজবুলি ভাষায় প্রাচীনতম একটি পদ। অসংখ্য পাঁচালি, পুঁথি, পুরাণের রচনা মাণিক্যদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল যা আধুনিক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আধুনিক যুগের রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন 'বাংলার বিক্রমাদিত্য'। তাঁর দরবার সেদিন কাশ্মীর থেকে গোয়ালিয়র, লখনউ থেকে ত্রিপুরা, উত্তর ও পূর্ব ভারতের গুণী সাহিত্যিক শিল্পী কলাবিশারদদের উপস্থিতিতে আলোকোজ্জ্বল ছিল। বীরচন্দ্র স্বয়ং বিবিধ কলা বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও ফোটোগ্রাফিতে ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষে ফোটোগ্রাফি চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম স্বীকৃতি দেন মহারাজ বীরচন্দ্রই। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন যে— ''জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই (বীরচন্দ্র) তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন তার অভিনন্দনের দ্বারা।'' পরবর্তী শেষ তিনজন মহারাজ ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাদের মহানুভবতা শিষ্টাচার এবং গুণগ্রাহিতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

মহারাজ বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তথা মহারাজ রাধাকিশোর ছিলেন দাতাকর্ণ। তাঁর দানের পরিধি, জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনে যেমন দেখা যায় তেমনি রবি ঠাকুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতেও উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এছাড়াও বহু দুঃস্থ কবি সাহিত্যিকদের সাহায্য করতে দেখা যায় রাধাকিশোরকে। রাধাকিশোরের যোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর ছিলেন উঁচুদরের চিত্রশিল্পী ও এক দৃঢ়চেতা শাসক। তাঁর বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে ইউরোপ থেকে চিত্রশিল্প বোদ্ধারা আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে ভিড় জমাতেন। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের পুত্র মহারাজ বীরবিক্রম ছিলেন ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নৃপতি। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক। ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এক প্রজাবৎসল রাজা। তিনি ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ে এখনও সম্মানের সঙ্গে বিরাজ করছেন। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক মাণিক্যদের রাজকীয় আভিজাত্য ও রাজমহিমা আবহমানকাল ধরে ভারতের গর্ব ও অমূল্য সম্পদ। তাই রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন—

''ভারতীয় পুরাণ, কাব্য পাঠ করে প্রাচীনকালের রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা মনে জন্মায়, সেই সব গুণাবলী ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে দেখেছি।'' ■

ঊনকোটি শিবমন্দির

ঊনকোটি মানে কোটি থেকে এক কম। ৭ম থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়ে নির্মিত এই মন্দির তৈরির পিছনে একটি গল্প আছে। শিব এক কোটি দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে কাশী যাচ্ছিলেন। এই স্থানে তারা রাত্রিবাস করেন। শিব নির্দেশ দেন প্রত্যেককে সূর্যোদয়ের আগে উঠতে হবে। কিন্তু শিব ছাড়া কারোর ঘুম ভাঙেনি। শিব একাই রওনা দেন। বাকি দেবতারা এখানেই থেকে যান। তাদের সকলের প্রতিচ্ছবি রয়েছে মন্দিরে। পাহাড় কেটে তৈরি করা মন্দিরটি শিল্পসুষমায় অনুপম।

ত্রিপুরার সাধক-সাধিকা

প্রদীপ আচার্য

ত্রিপুরা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্মের এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র বলে পরিচিত। ত্রিপুরায় সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্মের অনুগামীদের সংখ্যা প্রায় ৮৮ শতাংশ। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু মন্দির, আশ্রম এবং সাধক-সাধিকা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন সাধক এবং সাধিকার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস নিলাম।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরটি উদয়পুরে। জায়গাটা আগরতলা থেকে ৫৫ কিলোমিটার। সারা ভারতে ত্রিপুরাকে অন্যতম পবিত্র হিন্দুভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। এর প্রধান কারণ ত্রিপুরা একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম। বলা হয়, সতীর ডান পা পড়েছিল এখানে। ত্রিপুরায় তিনি ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরী। মন্দিরের গড়নটি অনেকটা বাংলার কুঁড়ে ঘরের মতো। বর্তমান মন্দিরটি ১৫০১ সালে মহারাজ ধন্যমাণিক্য তৈরি করেন। মন্দিরে রয়েছে একই দেবতার দুটি মূর্তি—এদের মধ্যে যিনি ৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট তিনিই ত্রিপুরাসুন্দরী। অন্যজন ২ ফুট উচ্চতার ছোটিমা।

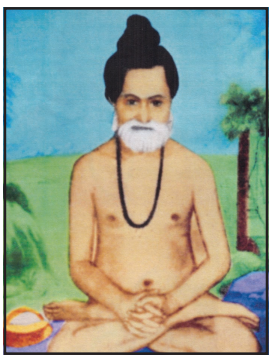

ঠাকুর হংসরাজ সোহংমণি : রানির বাজার মোহনপুরের কাছে ব্রজনগর গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুর হংসরাজ সোহংমণির অপূর্ব সুন্দর সমাধি মন্দির ও আশ্রম। তিনি তাঁর অগণিত শিষ্য ও ভক্তের কাছে ভগবান শিবের অবতার বলে পরিচিত। তিনি লোকালয়ে থেকেও প্রায় ৪২ বছর একাসনে এবং ৩৮ বৎসর মৌন ছিলেন। বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি বিভূতির ব্যবহার খুব কমই করেছেন। বাংলাদেশের মোভাড়ার মহাশ্মশানের এক মাঠে প্রায় ১৮ বছর তিনি কঠোর তপস্যা করে ভগবান শিবের দর্শন এবং কৃপা পেয়েছিলেন। হাজার হাজার মানুষের জাগতিক সমস্যার সমাধান করে তিনি ভগবান শিবের অবতার হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বাংলাদেশের মণিঅন্ধ গ্রামের নিষ্ঠাবান শিবভক্ত রামচন্দ্র নাথ এবং ভক্তিমতী মহিলা বরদা সুন্দরীর একমাত্র পুত্র রূপে ১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মা ও বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন সুরেন্দ্র। কিশোর বয়স থেকেই তিনি দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। সেদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে প্রথমে জরানন্দ গিরি এবং পরে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ললিতানন্দ সোহংমনির কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র প্রাপ্ত হন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক হিন্দু নিধন শুরু হলে শিষ্যগণ তাকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এবং ব্রজপুরে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ বিশেষ কারণে তিনি মৌনব্রত ভঙ্গ করলেও আসন ত্যাগ করেননি। প্রায় ৮৬ বছরে ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন অগণিত ভক্ত ও শিষ্যদের রেখে ব্রজপুর আশ্রমে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামী : শ্রীমতী রাধারানিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমতী রাধারানি এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোপী ভাবে ভজনাকারী পরম ভক্ত শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামী। তার আশ্রমে শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণবদের বিগ্রহের অপূর্ব মিলন লক্ষ্য করা যায়। আশ্রমে অন্যতম মূল আকর্ষণ হলো হাজার শাখাযুক্ত তমাল গাছ। ভারতের অন্য কোথাও এমন দর্শনীয় তমাল গাছ রয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। তিনি ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষের কাছে পরম বৈষ্ণবরূপে পরিচিত ছিলেন। সারা ত্রিপুরায় তাঁর শিষ্য এবং অনুগামীগণ রয়েছেন। বাংলাদেশের সিলেট জেলার গাঙধার গ্রামের পরম নিষ্ঠাবান হরেকৃষ্ণ রায়চৌধুরী এবং প্রবোধিনী রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্ররূপে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে যে সন্তান আবির্ভূত হন তার নাম রাখা হয় হরিদাস। তিনিই পরবর্তী জীবনে পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই মহাসাধক কিশোর বয়সেই

অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে শুরু করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হলে পিতা তাকে জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। কিশোর বয়সেই তিনি আমিষ খাদ্য বর্জন করেছিলেন, তাই কয়েক মাস পর তিনি পিসিমার বাড়িতে চলে আসেন। সেখানেই তিনি নবদ্বীপ থেকে আগত গৌরাঙ্গনন্দ গোস্বামীর কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে মহোৎসব অনুষ্ঠানে স্বল্প খাদ্য সামগ্রী দ্বারা হাজার হাজার লোককে ভোজন করাতে পারতেন। তিনি বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করেছেন। ত্রিপুরার বাইরেও তার আশ্রম রয়েছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ, (১৭ ফাল্গুন) মঙ্গলবার রাত প্রায় ৯টায় রাধাকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে করতে সজ্ঞানে নিজ আশ্রমে মর্ত্যলীলা শেষ করে গোলকধামে চলে গেছেন।

শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা : শ্রীশ্রী স্নেহময়ী মা ত্রিপুরার মানুষের কাছে এক পরিচিত নাম। তিনি হিন্দুধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য জন্মদিনকে কেন্দ্র করে গত ১৬ বছর ধরে আগরতলা জয়নগর শ্রীশ্রীমা স্নেহময়ী আশ্রমে ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্তমহাত্মাদের নিয়ে ধর্মসম্মেলন করেন এবং পাঁচদিন ব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছেন। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত উচ্চপদস্থ অনেক ভক্ত মায়ের কাছ থেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মাকে নিয়ে ৪টি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরার বাইরে কলকাতার হিন্দমোটরের কাছে মায়ের একটি আশ্রম রয়েছে। সেখানে সপ্তাহে একদিন বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং বছরে দু'বার সন্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আগরতলার জয়নগর আশ্রমেও শ্রাবণী অমাবস্যায় মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং পৌষসংক্রান্তিতে মহা উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিনি বেশ কয়েকবার ভারতের বহু তীর্থ পরিক্রমা করেছেন। ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলায় মায়ের অনেক শিষ্য ও ভক্ত রয়েছেন। ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া মহকুমার রাজনগর গ্রামে চিন্তাহরণ সরকার এবং মা সুরুচিদেবীর কোল আলো করে যে মেয়ের জন্ম হয় ১৩৫৯ বাংলার পৌষ পার্বণের শেষ রাতে সেই মেয়ের নাম রাখা হয় অপর্ণা। সুভাষ সাহা মায়ের এক ভক্ত মায়ের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে নাম রাখেন স্নেহময়ী মা। এই নামটিই শিষ্য এবং ভক্তগণ ব্যবহার করে আসছেন। তার জীবনে কিশোরী বয়স থেকে বিভিন্ন বিভূতির প্রকাশ ঘটতে থাকে। ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ মায়ের বিভূতিলীলার পরিচয় পেয়েছেন এবং মায়ের কৃপায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। মা এখনো বর্তমান এবং মানুষের উপকার করে চলেছেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আগরতলার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীশ্রী গায়ত্রীমাতা সরস্বতী : আগরতলা থেকে সেকেরকোট যেতে চৌমুহনী বাজার থেকে একটি রাস্তা পূর্বদিকে চলে গেছে। দশ মিনিট পায়ে হাঁটা পথ। মায়ের আশ্রমের নাম আনন্দময়ী কালীবাড়ি। সেখানেই প্রায় তিন কাঠা জমি নিয়ে মায়ের আশ্রম, সাধুনিবাস এবং মন্দির। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মায়ের শিষ্য ও ভক্তগণ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কালো পাথরের চার ফুট মা-কালীর বিগ্রহ। পদতলে সাদা পাথরে নির্মিত প্রায় চার ফুট শায়িত শিবের বিগ্রহ। পাথরের তৈরি এত বড় বিগ্রহ আর কোথাও রয়েছে বলে মনে হয় না। আশ্রমে তো দক্ষিণেশ্বরের শিবলিঙ্গের মতো বড় কালো পাথরের এক শিবলিঙ্গও দান করেছেন কলকাতার এক উপকৃত ভক্ত। মায়ের আশ্রমেও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং মায়ের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সন্ত সম্মেলন এবং ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলকাতা এবং ত্রিপুরায় মায়ের বহু শিষ্য রয়েছেন। মায়ের জীবন দিব্য বিভূতিতে পরিপূর্ণ। বিভূতির মাধ্যমে মা বহু মানুষের জাগতিক উপকার সাধন করেছেন এবং ধর্মীয় পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। সিলেট জেলার মাধবপুর থানার স্বর্ণব্যবসায়ী নগেন্দ্রচন্দ্র বণিক এবং স্ত্রী কুমুদকামিনী দেবী পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। ত্রিপুরা সরকার এমন বহু বিপন্ন পরিবারকে অরুন্ধতীনগর শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় দেন। এই শিবিরেই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর ১৩ পৌষ শেষরাতে চাঁদের মতো ফুটফুটে যে কন্যাটির জন্ম হয় মা-বাবা সেই কন্যার নাম রাখেন উমা। সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরুদেব মায়ের নামকরণ করেন শ্রীশ্রী গায়ত্রীমাতা সরস্বতী। তিনি এখনো জীবদেহে রয়েছেন এবং প্রতিদিন মানুষকে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্ত হবার আশীর্বাদ দান করছেন। মা দীর্ঘকাল জীবদেহে অবস্থান করে মানুষের কল্যাণ করুন এই কামনা করি। ■

চতুর্দশ মন্দির

রাজধানী আগরতলার সাবেকি অংশে চতুর্দশ মন্দিরের অবস্থান। জায়গাটি শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে আট কিলোমিটার দূরে। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট এইসব মন্দির চোদ্দজন দেবতার পীঠস্থান। বুরাসা, লাম্পরা, বিক্ষত্র, অক্ষত্র থুমনাইরক, সাঙ্গরোমা, মুড়াইকোত্তর, মইলুমা নোকসুমুতাই, সুকাল সুতাই, বোনিরক, টুইমা, সঙ্গরাম এবং খুলামা হলেন চোদ্দজন দেবতা। এই দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্তিক, সরস্বতী, গণেশ, সমুদ্র, পৃথিবী, অগ্নি, গঙ্গা, হিমাদ্রি, কামদেব প্রমুখ হিন্দু দেবদেবীর স্থানীয় সংস্করণ।

শহিদ সন্ত গুরুদেব শ্রীশ্রী শান্তিকালী

ডাঃ অতুল দেববর্মা

ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত পাঁচশত বছরে প্রায় দুই শতাধিক সন্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং উনকোটির শৈব ভূমিকে কৃপাঞ্জলি করে গেছেন। ওই সাধু সন্ত মহামানবদের মধ্যে পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রীশ্রী শান্তিকালী শুকতারার ন্যায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। গুরুদেব শান্তিকালীর আবির্ভাব ও তিরোধান দুটোই অলৌকিক ঘটনা, যেন ভগবানের পূর্ব পরিকল্পিত ও নির্ধারিত। যখন বিগত শতাব্দীর আশির দশকে ভয়াবহ জাতীয় দাঙ্গা ও পরবর্তী সময়ের অবিশ্বাস আর অশান্তির মহল সারা ত্রিপুরা ছেয়ে ছিল তখনই গুরুদেব শ্রীশ্রী শান্তিকালী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংহতি ও শান্তির বাণী নিয়ে ত্রিপুরার মাঠে ঘাটে অবতরণ করেছেন। আত্মীয় স্বজনহারা দুঃখে ভারাক্রান্ত সন্তপ্ত পরিবারের মানুষের ক্ষতে তিনি করুণা ও স্নেহের মলম লাগাতে শুরু করেছিলেন। ত্রিপুরা তথা বিশ্ববাসীর উদ্দেশে গুরুদেবের বাণী : 'তোমরা হিংসা পরিত্যাগ কর। তোমরা একই মায়ের সন্তান। তোমরা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ত্রিপুরা তথা বিশ্বকে শান্তি-সমৃদ্ধি তথা ভ্রাতৃবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিও। তোমাদের প্রতি আমার এই আশীর্বাদ রহিল।'

গুরুদেবের সম্পূর্ণ জীবনই ছিল অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। মাতা খঞ্জন ত্রিপুরা ও পিতা ধনঞ্জয় ত্রিপুরার নবম সন্তান হলেন শান্তি ত্রিপুরা। পর পর সাত সন্তানের জন্মের সময়েই মৃত্যু বা বাল্য বয়সে মৃত্যুর পর মাতা খঞ্জন দেবী পুত্রশোকে অজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন পুত্র সন্তান পেতে শিব ব্রত পালন করার জন্য। ধনঞ্জয়ও সেই একই স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। ত্রিপুরা দম্পতি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি সোমবার উপবাস থেকে শিব ব্রত পালনের দু' বছর পরে অষ্টম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। আর কঠোর নিয়ম ও আস্থার সঙ্গে দীর্ঘ বারো বছর শিব ব্রত পালন করে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ে সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ মন্দির তীর্থে গমন করেন।

মন্দির ৭০০ সিঁড়ি উপর উঁচু পাহাড়ে। মন্দিরের আধাপথ গিয়েই ধনঞ্জয় ও খঞ্জন দেবী ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখনই এক সন্ন্যাসী তাদের নৈবেদ্য শিবের চরণে অর্পণ করবে বলে তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছা জানালেন। তখন তারা নিজেরাই করবেন বলে জানালেন। কিন্তু তারা সেই সিঁড়ির উপরে আর চড়তেই পারলেন না। বাধ্য হয়ে সেই সন্ন্যাসীকে তাদের সব পূজার সামগ্রী দিয়ে শিবপূজায় সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। তখন সন্ন্যাসী তাদের আশীর্বাদ

নীরমহল

প্রাসাদটি ত্রিপুরার রাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তৈরি করেন রুদ্রসাগর হ্রদের মাঝখানে। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৩০ সালে। শেষ হয় ১৯৩৮ সালে। আগরতলা থেকে ৫৩ কিলোমিটার দূরে মেলাঘপুরে নীরমহলের অবস্থান। জলপ্রাসাদ সারা ভারতে আরও একটি (জলমহল, রাজস্থান) থাকলেও নীরমহল বৃহত্তম। নীরমহল ছিল মাণিক্য রাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। রুদ্রসাগরের মাঝখানে প্রাসাদ তৈরি জন্য মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ব্রিটিশ সংস্থা মার্টিন অ্যান্ড বার্নকে অনুরোধ করেন নির্মাণসহায়তার জন্য।

দিলেন এবং জটার একটা চুল ছিঁড়ে তা জলে ডুবিয়ে সেই জল খাওয়ার জন্য আজ্ঞা দিয়ে বলেন এতে তাদের এক পুত্রসন্তান লাভ হবে আর তার নাম শান্তি রাখতে হবে।

তীর্থযাত্রার চার মাসের মাথায় খঞ্জন দেবীর গর্ভে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সে দিনটা ছিল ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার রাত, যেটা এক অবিশ্বাস্য। কারণ সীতাকুণ্ডে তীর্থযাত্রার সময় খঞ্জন দেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন না, বরং সাত বছর আগেই তাঁর মাসিকধর্ম বন্ধ হয়েছিল। চন্দ্রনাথ মন্দিরের সন্ন্যাসীর কথামতো ছেলেটির নাম রাখা হলো শান্তি কুমার ত্রিপুরা।

বাল্যকাল থেকেই শান্তি ত্রিপুরার খেলাধুলা, চালচলন, আসক্তি, আচার-ব্যবহার ছিল অন্য সাধারণ ছেলেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শান্তি ত্রিপুরা খুব বেশি পড়াশুনা করার সুযোগ পাননি, প্রাথমিক শেষ করে ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষায় তার মন ছিল না। মা-বাবা অনেক চেষ্টার পরও তাকে আর শিক্ষালয়ে পাঠাতে পারেননি। কিশোর বয়সে একদিন মাতা-পিতার অজান্তে নিজ বাড়ি সাব্রুম থেকে একাই চলে যান আশি কিলোমিটার দূরে উদয়পুরের বিখ্যাত শক্তিপীঠ ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে। সেখানে দু' রাত দু' দিন কাটানোর পর চলে যান দশ কিলোমিটার দূরে কাঁকড়াবনের এক মসজিদে। এখানে সাতদিন থাকার পর আবার চলে যান বারো কিলোমিটার দূরে মেলাঘরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে। এখানে থাকাকালীন তার ভিতর স্বাভাবিক মানুষের স্বভাব দেখা যায়নি, তিনি যেন উন্মাদনা রোগে ভুগছেন। তখন আশ্রমের মহারাজ তার বাবার নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে তার পিতার কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য চিঠি পাঠান। ধনঞ্জয় মহারাজের উপদেশ মতো হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু হাসপাতালেও তাকে রাখা গেল না। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে আবার পালিয়ে গেলেন, কারণ ত্রিপুরেশ্বরী মাতা যে তাকে অনবরত ডাকছেন। তখন তাকে রাঁচির মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কিশোর শান্তি ত্রিপুরা কিছুতেই রাজি নয়, শুধু একটা শর্তে রাজি, যে যাওয়ার আগে তাকে চোদ্দ দেবতা মন্দির, জগন্নাথ বাড়ি মন্দির, দুর্গাবাড়ি মন্দির-সহ ত্রিপুরার সমস্ত মন্দির আর তীর্থস্থান দর্শন করাতে হবে। পিতা রাজি হয়ে তাকে প্রথমে জগন্নাথ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানকার ব্রহ্মচারিণী তাকে দেখেই বললেন, 'তোমরা যাকে পাগল বলছ তিনি মোটেই পাগল নন, যারা তাকে পাগলা গারদে দিতে চাইছে আসলে তারাই পাগল।' অবশেষে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বাতিল হলো।

প্রথমে শান্তি ত্রিপুরা অসাধন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি চৌদ্দ দেবতা মন্দিরের অনতিদূরে চাম্পামুড়ায় মাতৃপূজা শুরু করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরায় তাঁর নিজ জন্মস্থান মনুতে তিনি প্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণ দেববর্মা, রাণু দেববর্মা আর শিবশঙ্কর সাহা— এই তিনজনকে তিনি প্রথম দীক্ষা দেন। আশ্রমে নিয়মিত প্রতিদিন মায়ের পূজা, ত্রিকাল সন্ধ্যা শুরু করে দেন। দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রী, ভক্ত, শিষ্য সেই মন্দির আশ্রমে আসতে থাকেন। শান্তি ত্রিপুরার মাতা-পিতা বারো বছর শিব সাধনার পর এবং অনেক বাধা বিপত্তির পরে তাকে যৌবনে পরিণত করিয়েছেন। সুতরাং মা-বাবা চান না যে তাদের পুত্র সংসারের নিয়ম ভেঙে সন্ন্যাসী হয়ে যাক। তাই পুত্রের সন্ন্যাস জীবনের রাস্তায় তারা অন্তরায় হয়ে বসেন। তাঁদের ইচ্ছা পুত্রকে যে করেই হোক বিয়ে দিতে হবে, তাতেই যদি পুত্রের মন সংসারের দিকে ফিরে আসে। অনেক বাদবিবাদের পর শান্তি ত্রিপুরা এক শর্তে রাজি হলেন যে তাকে দশ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে। রীতিমতো বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু তিনি দশ দিনের মাথায় নবপরিণিতা বধূকে রেখে ত্রিপুরার অন্যতম পবিত্র তীর্থ ও ঐতিহ্যপূর্ণ তীর্থমুখের পর্বতশিখরে ছয় মাস ধ্যানস্থ হয়ে তপস্যা করেন।

শ্রী শান্তি ত্রিপুরা এখানে মোহমায়ার সংসার করতে আসেননি। মাত্র সাত বছর সংসারধর্ম পালন করার পর ছয় মাসের মেয়ে-সহ দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে তিনি প্রথমে ত্রিপুরার বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। তারপর তিনি বেলুড়মঠের রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে ছয় মাস অতিবাহিত করেন। সেখানে মহান সাধু সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে ধর্মশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি

ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ত্রিপুরা ভারতের অন্যতম সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য। আট নং জাতীয় সড়ক ত্রিপুরাকে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে ছড়িয়ে রয়েছে বরোমুড়া, আথারমুড়া, লংথারাই, শাখান এবং জামপুই পর্বতমালা। ত্রিপুরার অর্ধেকটা জুড়ে বনাঞ্চল। এছাড়া ত্রিপুরার তিনদিকে বাংলাদেশ। তাই অনুপ্রবেশের সমস্যা ত্রিপুরায় ভয়াবহ।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ছিল ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ। এখানেই ত্রিপুরার রাজারা বসবাস করতেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ১৮৯৯ সালে এই প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। শেষ হয় ১৯০১ সালে। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি পর্যন্ত মাণিক্য বংশের রাজারা এখানেই বসবাস করেছেন। ১৯৭২-৭৩ সালে ত্রিপুরা সরকার কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় প্রাসাদটি রাজবংশের কাছ থেকে কিনে নেয়। তারপর এই প্রাসাদটি হয়ে ওঠে ত্রিপুরার বিধানসভা ভবন। ২০১১ সাল পর্যন্ত তাই ছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠ থেকে তিনি চলে যান বীরভূমের তারাপীঠের আশ্রমে। সেখানে দুই বছর অবস্থানকালে ধর্মীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান সঞ্চয় করেন। সেখানে থাকাকালেও অনেক জ্ঞানপিপাসু ভক্ত তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দুই বছর থাকার পর সেখান থেকে তিনি হিমালয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই রাতেই মা ত্রিপুরা সুন্দরী স্বপ্নে তাকে ত্রিপুরায় ফিরে গিয়ে সনাতন ধর্ম রক্ষা ও প্রচারের জন্য আদেশ দেন। তখন তিনি ত্রিপুরায় ফিরে মানব কল্যাণ ও পারমার্থিক কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন।

এই দিশায় তিনি প্রথম সাব্রুমের মনুতে ১৯৭৯ সালে ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমে মাতৃশক্তিরূপে মাতা কালিকা স্থান করেন, সঙ্গে শিব, গণেশ, দুর্গা, মা ভগবতী ও আরও অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন। আশ্রমে প্রতিদিন মায়ের পূজার্চনা, আরতি, ভজন, কীর্তন, প্রার্থনাসভা ও সৎসঙ্গ হতে লাগলো। অনেক সাংসারিক মানুষ, ধর্ম পিপাসু, ভক্ত আশ্রমে এসে ভিড় করতে লাগলেন। সাধক শান্তি ত্রিপুরা 'গুরুদেব শ্রীশ্রী শান্তিকালী' নামে পরিচিত হলেন। গুরুদেব শান্তিকালীর বাণী সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে লাগলো। লোকের সাধারণ ভাষায় তিনি ধর্মশিক্ষা, উপদেশ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তিনি বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা দেখালেন। তার মধ্যে গুরুদেবের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতাও ছিলেন। মাত্র সাতটি চালে দুধ, বাতাসা দিয়ে তিনি এক হাঁড়িতে রান্না করে সেই হাঁড়ি ভর্তি অন্নভোগ করেছিলেন, আর সেই হাঁড়ি থেকে সমগ্র গ্রামবাসীকে খাওয়ানোর পরও শেষ হয়নি। মায়ের দর্শন পাবার জন্য অনেকেই গুরুদেবকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, মাকে তো এই সাধারণ চোখে দেখা যাবে না, তাই তিনি তাদেরকে মায়ের প্রতিবিম্ব দেখিয়েছিলেন। বর্ষার সময় যখন গ্রামের উপনদী তৈকুমবা জলে স্ফীত ছিল, গুরুদেব খড়ম পায়ে সেই প্লাবিত ছড়া হাঁটতে হাঁটতে ওপার থেকে এপারে চলে এসেছিলেন। এই সব এরকম আরও অনেক অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কীর্তি জনমুখে গ্রাম ও শহরে প্রচার হতে থাকে। সর্বপ্রথমে ১১ জন স্ত্রী ও ১১ জন পুরুষ একসঙ্গে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তার পরে আর কত শত শত লোক তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন হিসাব আর রাখা যায়নি। এই ভাবে প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গুরুদেবের মহিমা দিক থেকে দিগন্তরে পৌঁছে যায়।

শ্রীশ্রী শান্তিকালীর জনপ্রিয়তা ও জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনগ্রাহ্যতা সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এক এক করে ১০টি আশ্রম ও মন্দির ত্রিপুরার প্রতিটি কোণায় প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুদেবের প্রভাবের জন্য বিদেশি ধর্মপ্রচারক বা মিশনারিরা তাদের ধর্মান্তরণে বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। তাদের অভিযানে আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করতে পারায় তারা গুরুদেবকে তাদের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে গুরুদেব শান্তিকালীর নামে গুজব ও কুৎসা ছড়ায়। গুরুদেবের চরিত্র হনন করে নানা মিথ্যা সারা রাজ্যে প্রচার করে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। বিদেশি মদদপুষ্ট উগ্রবাদী এন.এফ.টি প্রথমে এক এক করে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ভবেশ দেববর্মা, শচীন্দ্র দেববর্মা, বিশ্ব দেববর্মা-সহ বহু শিষ্যকে হত্যা করে। গুরুদেব জেনে গেছেন তাঁর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে কে তার উত্তরাধিকার হবে জানিয়ে দিলেন। অবশেষে সেই দুর্ভাগ্যপূর্ণ অভিশপ্ত দিন এসে পড়ে। সেই দিনটা ছিল ২৭ আগস্ট ২০০০ সাল।

গুরুদেব তার প্রধান আশ্রম জিরানিয়ায় সন্ধ্যা আরতির পর সৎসঙ্গ করছিলেন। তখন এক যুবক এসে বলল যে সে গুরুদেবের নিকট গিয়ে আশীর্বাদ নিতে চায়। গুরুদেব তাকে নিকটে আসতে বললেন। তখন সেই এন.এল.এফ.টি উগ্রবাদী আততায়ী গুরুদেবের চরণ ছুঁয়ে নমস্কার করার ছলে পিস্তল বের করে গুরুদেবের বুকে পর পর তিন চারটি গুলি করে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত হয়ে গুরুদেব সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। তিনি শেষ বাণী দিয়ে যান : 'তোমরা মনে করিওনা আমি তোমাদের ছেড়ে চলে গেছি, আমি যুগে যুগে তোমাদেরই ছিলাম, এখনো তোমাদের কাছে আছি আর যুগে যুগে তোমাদেরই থাকব।' ■

চিরায়ত ঐতিহ্যের ধারক
মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির

দীপক কুমার দেব

ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর ভারতের একান্ন পীঠের একটি বলে স্বীকৃত। আজ থেকে পাঁচ শতাধিক বছর আগে এই পবিত্র পীঠভূমিতেই স্থাপিত হয়েছিল মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। গোমতী জেলা সদর উদয়পুর শহর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে আগরতলা- সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশেই রয়েছে একান্ন পীঠের এক পীঠ— মাতাবাড়ি, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। সারা বছর ধরেই এখানে পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। দেওয়ালি এখানকার অন্যতম উৎসব। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের ঐতিহাসিক উল্লেখ 'ত্রিপুরা বুরুঞ্জী'-তে পাওয়া যায়। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজার প্রতিনিধি হিসেবে রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস ত্রিপুরা ভ্রমণে আসেন এবং প্রায় বছরখানেক রাঙামাটি তথা উদয়পুরে অবস্থান করেন। তাঁদের দিনলিপিই পরবর্তী সময়ে 'ত্রিপুরা বুরুজী' বা 'ত্রিপুরা দেশের দিনকড়চা' নামে প্রকাশিত হয়। রত্নকন্দলী লিখেছেন— 'রাজার নগরের দক্ষিণে গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে। উহা উচ্চতায় আনুমানিক চল্লিশ হাত হইবে। ওই মন্দিরে ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর মূর্তি আছে।' এখানে ত্রিপুরাসুন্দরীকেই যে ত্রিপুরা ঠাকুরানী বলা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির একটি অন্যতম শাক্তপীঠ। নানা তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে পীঠমালা, তন্ত্রচূড়ামণি, শিব চরিত ইত্যাদিতে একান্ন পীঠের একটি ত্রিপুরা পীঠের পরিচিতি আছে। পুরাণোক্ত কাহিনিতে সতীর দেহাংশ পতনের বর্ণনা অনুযায়ী এক একটি পীঠ নিরূপিত হয়েছে। 'পীঠ নির্ণয়' বা মহাপীঠ নিরূপণ তন্ত্রে উল্লেখ আছে : 'ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরানলঃ' অর্থাৎ ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণপদ পড়েছিল। সেখানে দেবীর নাম 'ত্রিপুরা' এবং ভৈরবের নাম 'নল'। শিবচরিতে বলা হয়েছে,—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
ভৈরব ত্রিপুরী দেবঃ সর্বসম্পতস্য দায়ক।।"

অর্থাৎ ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণপদ পড়েছিল, সে স্থানের দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এবং ভৈরব হলেন ত্রিপুরেশ, দেবী সর্বসম্পদ প্রদানকারিণী। 'পীঠমালা তন্ত্রে' বলা হয়েছে—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
ভৈরব ত্রিপুরেরশ্চ সর্বাভিষ্ট ফলপ্রদ।।"

অর্থাৎ ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল, সে স্থানের দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এবং ভৈরব ত্রিপুরেশ, দেবী সর্ব অভীষ্টের ফল প্রদানকারিণী।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের শিলালিপির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, মহারাজ ধন্যমাণিক্য মন্দির নির্মাণ করে অম্বিকাকে দান করেন।

'আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্য দেবো যাগে যস্যাশ্বরেশঃ ক্ষিতিতলমগমবৎ কর্ণতুলস্য দানৈঃ। শাকে বহ্নাক্ষিবেধামুখ ধরণীয়তে লোকমাত্রে হম্বিকায়ে প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং মগনদরিগতং সেবিতায়ে স দেবৈঃ।।' অর্থাৎ পূর্বকালে সমগ্র গুণসম্পন্ন ধন্যমাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি দানে কর্ণতুল্য ছিলেন। তাঁহার যুগে স্বর্গাধিপতি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৪২৩ শকাব্দে গগণভেদী এই প্রাসাদ দেবগণ সেবিতা লোক জননী অম্বিকাকে দান করেন।

এই শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুরার ১৪৫তম রাজা মহারাজ ধন্যমাণিক্য (রাজত্বকাল ১৪৯০-১৫১৫ খ্রি.) ১৪২৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির নির্মাণ করান।

উদয়পুরের মাতাবাড়িতে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে অনেক লোককাহিনি প্রচলিত আছে। 'চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য' থেকে জানা যায় যে অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক রজকের একটি কামধেনু ছিল। আহারের সন্ধানে ওই কামধেনুটি প্রতিদিন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতো। এতে রজকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সে একদিন কামধেনুটিকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখে যে, কামধেনু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার বাঁট থেকে অজস্র ধারায় দুধ ঝরে পড়ছে। রজক সেখানে গিয়ে অষ্টমূর্তি-সহ একটি শিবলিঙ্গ দেখতে পায়। এই শিবলিঙ্গই হলো চন্দ্রনাথ তীর্থের 'স্বয়ম্ভুনাথ'।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই শিবলিঙ্গের কথা শুনে লোকজন নিয়ে চন্দ্রনাথ তীর্থে উপস্থিত হন এবং এই শিবলিঙ্গ তাঁর রাজধানীতে আনার জন্য খননকার্য চালান। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও স্বয়ম্ভুনাথকে সরানো গেল না। মহারাজ সেই রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে শিবলিঙ্গ নেওয়া যাবে না, তবে তিনি আগামীকাল

রাত্রির মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরীকে নিয়ে যেতে পারেন। রাত পোঁহালে দেবী সেখানেই অচলা হবেন। রাজার লোকজন দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীকে নিয়ে রওনা দিয়ে রাত্রি প্রভাতে বর্তমান মাতাবাড়ির কূর্মাকৃতি জায়গায় এসে পৌঁছালে দেবী সেখানেই স্থিতা হলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সেখানেই মন্দির নির্মাণ করে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাজমালায় বলা হয়েছে যে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ ধন্যমাণিক্য একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরাসুন্দরীকে নিয়ে এসে সেই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা করেন।

উদয়পুরে এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, বর্তমান বিগ্রহ মাতাবাড়ির নিকটবর্তী ব্রহ্মছড়ার কোনো স্থানে জলমগ্ন ছিল। ত্রিপুরা নরপতি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পীঠস্থানে এই বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের গঠনরীতি ত্রিপুরার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুরম্য সিংহদুয়ার নেই। মন্দিরের দেওয়ালে চিত্রকলা নেই। মন্দিরের ভেতরে প্রাচীরচিত্র নেই। গর্ভগৃহ চারকোণা বিশিষ্ট। পোড়া ইটের তৈরি স্তূপশীর্ষ চারচালাকৃতি দেবালয়। মন্দিরের বাইরের পরিমাপ ২৪ ফুট × ২৪ ফুট এবং ভিতরের পরিমাপ ১৫ ফুট × ১৬ ফুট। মন্দিরের উচ্চতা ৭৫ ফুট। চার কোণায় চারটি শক্ত স্তম্ভ। স্তম্ভগুলোর গোড়া মোটা, অগ্রভাগ ক্রমেই সরু। চারচালার উপর স্তূপাকৃতি গম্বুজ। উপরে রয়েছে সপ্তকলসীর ধ্বজদণ্ড। তাতে শোভমান পিতলের পতাকা। মন্দিরের মূলদ্বার পশ্চিমমুখী, তাছাড়া উত্তরদিকেও একটি দরজা রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে নাটমন্দির অনেক পরে নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়।

'রাজমালা' অনুসারে মায়ের জলকষ্টের কথা স্বপ্নাদেশে জানতে পেরে মন্দিরের পূর্বদিকে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য একটি বড় জলাশয় খনন করান। এটি 'কল্যাণ সাগর' নামে পরিচিত। এই দীঘির মাছ ও কচ্ছপের দৃশ্য আজও দর্শকের মনে বিরল আনন্দ প্রদান করে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তি কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত। উচ্চতা ১ মিটার ৫৭ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৬৪ সেমি.। দেবী সমপদ স্থানক আসনে শবাসনে শায়িত শিবের বক্ষের উপর পা দুটি স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীর চারটি হাত। ডানদিকের উপর হাতে বরাভয়মুদ্রা এবং নীচের হাতে অভয়মুদ্রা। বামদিকের উপর হাতে খড়্গ এবং নীচের হাতে অসুরমুণ্ড। দেবীর মাথায় জটা-মুকুট এবং মুকুটের দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ তরঙ্গায়িত জটার রাশি। গলায় ১৩টি নরমুণ্ডমালা। দেবীর মুখখানি গোলাকৃতি, নাক ছোট ও চ্যাপ্টা। চোখ দুটি তাঁর গোলাকার ও ছোট। দেবীর মুখখানিতে রয়েছে অরণ্যের সরলতা মাখানো পার্বতী জননীর মুখচ্ছবি। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে আর একটি প্রস্তরমূর্তি, যিনি 'ছোট মা' নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিতা। কথিত আছে যুদ্ধযাত্রার সময় ত্রিপুরার মহারাজগণ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর অনুকৃতি হিসেবে ছোট মা-র মূর্তিটিকে তাঁদের সঙ্গে রাখতেন। মায়ের ডান পাশে যে রুপার তৈরি ত্রিশূলখানা দেখা যায়, তা ত্রিপুরার ১৮৫তম মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর মহাপ্রয়াণের আগে স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের (১৯৪৬ খ্রি.) ১৬ বৈশাখ মাকে প্রদান করে গেছেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের আরেকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো এখানে শাক্তদেবীর সঙ্গে 'শালগ্রাম শিলা' রূপে ভগবান বিষ্ণু নিত্য পূজিত হন। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। শাক্ত এবং বৈষ্ণব সংস্কৃতির এই অপূর্ব সম্মিলন এই মন্দিরের মাহাত্ম্য আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

মাতাবাড়ির অন্যতম এক অকর্ষণ পেঁড়া। ক্ষীর ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরি এই প্রসাদ স্বাদে অতুলনীয়। প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন, লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিবিধ উপাচারে দেবীর ভোগ হয়। রোজ একটি পাঁঠা এবং প্রতি অমাবস্যায় পাঁচটি পাঁঠা, একটি মহিষ বলি হয়ে থাকে। তবে দশমী তিথিতে কোনো বলি হয় না।

মন্দির পরিচালনার ব্যবস্থাটির মধ্যেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মেলবন্ধনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে ব্রাহ্মণদের উপর পূজার ভার থাকলেও তাঁদের সহায্যকারীরা হলেন কায়স্থ এবং অন্যান্য বর্ণের হিন্দু। এদের বলা হয় 'টলুয়া'। মন্দিরে বলির কাজটি করে জনজাতি সমাজের দেববর্মা গোষ্ঠীর লোকেরা। তাদের বলা হয় 'গালিম'। এখনও অমাবস্যার নিশিপূজায় মোষ বলির দায়িত্বটা তাঁরাই পালন করেন। মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজটা করেন মালাকার সমাজের লোকেরা। বলির মহিষ, ছাগ ইত্যাদির জোগান দিত স্থানীয় মুসলমানরা। এছাড়াও ফুল, দূর্বা, তুলসী, কলাপাতা, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য নির্দিষ্ট লোক রয়েছে। এদের ভরণ পোষণের জন্য প্রত্যেককে নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন রাজন্যবর্গ।

এতে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে বহু পরিবার জীবন-জীবিকার প্রশ্নে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই মন্দিরের উপর নির্ভরশীল।

রাজ আমলে পরিচালনার জন্য ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের নামে কয়েক দ্রোণ সম্পত্তি ছিল। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের সঙ্গে যোগদানের পর মহারানির সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তির শর্ত অনুসারে মাতাবাড়ি পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। বর্তমানে গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা পদাধিকারবলে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর 'সেবাইত'। সেবাইতকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে সরকার মনোনীত উপদেষ্টা কমিটি। মহকুমা শাসকের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের সকল কাজ সমাধা হয়। রাজন্য যুগে গিরি ও পুরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ ওই কাজটি করতেন। বর্তমানেও চালু আছে।

■

ত্রিপুরার জাতীয় ব্যক্তিত্ব

ভাস্কর রায় বর্মণ

এই নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে সেই ব্যক্তিদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সামাজিক স্তরে এবং খেলাধুলায় যাঁদের অবদান বহির্জগতে ত্রিপুরাকে পরিচিত করে তুলেছে। যাঁদের নিয়ে আলোচনা করব তাঁদের পথিকৃৎ হলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা ভ্রমণ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন বা করছেন তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন বা করছেন যে রবীন্দ্রনাথই ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছেন। উনি কিন্তু সমৃদ্ধ করেননি, করেছেন সমৃদ্ধতর। রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় আগমনের অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরার রাজপরিবারে সাহিত্যচর্চা চলত নিরবচ্ছিন্নভাবে। রতনে রতন চেনে। বীরচন্দ্র উঁচুমানের কবি ছিলেন। তিনি নিজেও ছয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সেগুলি হলো 'হলি', 'সোহাগ', 'প্রেম মরীচিকা', 'উচ্ছ্বাস', 'কাল কুসুম' ও 'শ্রীশ্রীঝুলন'। তাই উনি রবীন্দ্রনাথকে চিনেছেন এবং তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ কবি' সম্মানে সম্মানিত করেছেন, সম্মানিত করেছেন তাঁর নিজের কবি প্রতিভাকে। এই সম্মান রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তির পূর্বাভাস বললে অত্যুক্তি হবে না। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে এই পুরস্কারটিই প্রথম স্বীকৃতি তাঁর কবি-প্রতিভার।

পিতা মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর বীরচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করে ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতি আধুনিকীকরণ করার দিকে সবিশেষ যত্নবান হলেন। বীরচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরার রাজদরবার হয়ে উঠল সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্রের খ্যাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল, এমনকী কাশ্মীর অবধি প্রসারিত হলো, যার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সঙ্গীতজ্ঞদের ত্রিপুরার রাজদরবারে আগমন ঘটতে লাগল।

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য

মহারানি ভানুমতী দেবীর অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় আগমনের ক্ষেত্র তৈরি হলো। তাঁর প্রিয় রানির মৃত্যুতে মহারাজ এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রাজকার্যে মনোনিবেশ করতে ভুলে গেছেন। এমন সময় তাঁর হাতে এসে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থটি। গ্রন্থটি এনে দিয়েছিলেন মহিমাচন্দ্র দেববর্মা যিনি মহিমঠাকুর বলে সর্বাধিক পরিচিত। মহিমচন্দ্র তখন কলকাতায় ডেভিড হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সেই স্কুলে পড়াকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সখ্য জন্মে এবং সেই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। সেই মহিমঠাকুর ঠাকুরবাড়ি থেকে 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থটি আগরতলায় এসে বীরচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। গ্রন্থটি পড়ে বীরচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হলো। উনি উপলব্ধি করলেন রবীন্দ্রনাথের

ত্রিপুরি

ত্রিপুরার প্রধান জনজাতি ত্রিপুরিরা। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এসে ত্রিপুরিরা ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করে। ধীরে ধীরে তারা অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপুরিরা ককবরক ভাষায় কথা বলে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এদের বেশিরভাগই হিন্দু। ত্রিপুরিরা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত। এদের ঐতিহাসিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সবিশেষ গুরত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্বের অন্য কোনও জনজাতির প্রভাব এদের ওপর পড়েনি।

জামাতিয়া

ত্রিপুরার ২১টি জনজাতির মধ্যে জামাতিয়ারা অন্যতম। এদের বসবাস মূলত পশ্চিম এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায়। জামাতিয়ারা প্রাচীন ত্রিপুরি ধর্মের অনুসারী। এরা গোরিয়া মুতাইয়ের উপাসক। গোরিয়া উৎসব এদের প্রধান উৎসব। এছাড়া এরা মুতাই, কোতর, টুইমা-সহ ১৪ দেবতার উপাসনা করে থাকে। জামাতিয়া সমাজে হোডা মানে সর্বোচ্চ। হোডার প্রধান হলেন ওকরা। পাঁচ বছরে একবার অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে গ্রামের চোকদিরি এবং ময়াল পঞ্চাইরা ওকরাকে নির্বাচিত করেন।

কবি-প্রতিভা এবং প্রদান করলেন 'শ্রেষ্ঠ কবি' সম্মান রবীন্দ্রনাথকে। তখনই রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় আগমনের সুর ধ্বনিত হলো।

মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য যখন সিংহাসনে বসলেন রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন বীরচন্দ্রের আমলে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তা হলো না। বরং রাধাকিশোর সে সম্পর্কটি মজবুত করলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতা যেতে হতো কার্যোপলক্ষে এবং সেই সুযোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন। কলকাতায় থাকাকালীন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা করাটা প্রায়ই ঘটত। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাধাকিশোর মাণিক্যের সখ্য গভীর হলো। একসময় রাধাকিশোর মাণিক্য দেখলেন রবীন্দ্রনাথ বিষাদগ্রস্ত হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর পরিবার নিয়ে শিলাইদহে থাকতেন এবং লেখালেখি ও কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে পেলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ। এই মৃত্যুসংবাদে রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেন। তদুপরি কুস্টিয়ায় তাঁর ব্যবসা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই দুই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিপর্যস্ত মনকে শান্ত করার জন্য রাধাকিশোর তাঁকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে আগরতলায় আসতে অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোর মাণিক্যের অনুরোধ রক্ষা করতে আগরতলায় এলেন। এ নিয়ে রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলেই রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় পাঁচবার ভ্রমণ করেছেন। রাধাকিশোর মাণিক্য বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী ত্রিপুরার রাজপরিবারে প্রথম মহিলা কবি যাঁর খ্যাতি ত্রিপুরার গণ্ডি পেরিয়ে ত্রিপুরার বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দ্বিতীয় মহিষী রাজেশ্বরী দেবীর গর্ভজাত কন্যা। বীরচন্দ্রের কবি-প্রতিভা তাঁর কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবীর ওপর বর্তেছে এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় অনঙ্গমোহিনী দেবীর বয়স যখন সাতের কাছাকাছি মহারাজ তাঁকে যথাযথ শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ ব্যাপারে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে সময়ে মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁর কন্যাকে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সেই সময়ে ত্রিপুরার মতো পার্বত্য রাজ্যে নারীশিক্ষা কল্পনাতীত ছিল। এমনকী বাংলায়ও তখন নারী শিক্ষা তেমন প্রসার লাভ করেনি বেথুন সাহেব, মদনমোহন তর্কবাগীশ প্রমুখর চেষ্টা সত্ত্বেও। ওই মনীষীদের চেষ্টায় বাংলায় যে পরিবর্তনের হাওয়া দেখা গিয়েছে তার একাংশ ত্রিপুরায় বয়ে এসেছে। এই হাওয়ার প্রভাবে বীরচন্দ্রের নেতৃত্বে পুরোনো ধ্যান-ধারণা

শচীন দেব বর্মন

ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে ঊর্ধ্বায়ন ঘটেছে ত্রিপুরার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির।

এমন পরিবর্তিত ও পরিশীলিত আবহাওয়ায় জন্মেছেন রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী। বীরচন্দ্র অনঙ্গমোহিনী দেবীর সঙ্গে বাংলায় কথাবার্তা বলতেন এবং তাঁরই সযত্ন শিক্ষায় অনঙ্গমোহিনী দেবী বাংলাভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাছাড়া পিতার পাশে বসে পিতার কাব্য রচনা সাগ্রহচিত্তে দেখতেন এবং দেখতে দেখতেই তাঁর কাব্য রচনায় আগ্রহ জন্মে। তার ফলশ্রুতিতে মাত্র এগারো বছর বয়সে অনঙ্গমোহিনী দেবী কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে কবিতাগুলি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর কবি-প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনঙ্গমোহিনী দেবীর তিনটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে, সেগুলি 'কণিকা' 'প্রেম গাথা' ও 'প্রীতি'।

মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাপ-ঠাকুরদার ধারাটি বজায় রেখেছেন। উনি নিজে ছিলেন উঁচুদরের চিত্রশিল্পী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর' অভিধায় ভূষিত করেন।

ত্রিপুরার গৌরব শচীন দেব বর্মনের নাম কে না শুনেছে? বিশ্ব জুড়ে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত। উনি ছিলেন ফিল্ম ইনডাস্ট্রির প্রথম যুগের স্বনামখ্যাত বলিউড সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার এবং সঙ্গীত- রচয়িতা। বিংশ শতকের চল্লিশ দশকের গোড়া থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতে সুর দিয়েছেন এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যু ১৯৭৫-এ।

১ অক্টোবর ১৯০৬ বাংলাদেশের কুমিল্লায় শচীন দেব বর্মন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম নির্মলা দেবী। পিতার নাম নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্মণ। যিনি ছিলেন ত্রিপুরার রাজা ঈশানচন্দ্র দেব বর্মনের দ্বিতীয় পুত্র। নবদ্বীপচন্দ্রের পুত্র-কন্যা নিয়ে নয় সন্তান। শচীন দেব বর্মন পাঁচ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ।

শচীন দেব বর্মন প্রথমে সঙ্গীতে তালিম নেন তাঁর পিতার কাছে, যিনি ছিলেন প্রথিতযশা ধ্রুপদ গায়ক এবং সেতারবাদক। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সঙ্গীতে তালিম নেন কে.সি. দেবের কাছে, পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত সারঙ্গবাদক কহিফা বাদল খান এবং বিখ্যাত সারঙ্গবাদক আল্লাউদ্দিন খান, এমনকী কাজি নজরুল ইসলামের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন। শচীন দেব বর্মনের পেশাগত কর্ম শুরু হয় ১৯৩২ সালে কলকাতা রেডিওতে ত্রিপুরার লোক-সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। তিনি লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাবার সময় পাননি তিনি।

১৯৪৪ সালে শচীন দেব বর্মন মুম্বই চলে যান। ১৯৪৬ সালে শশধর মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অশোক কুমারের দুটি ফিল্ম 'শিকারী' ও 'আট দিন'-এ কাজ করেন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে। এরপর থেকে শচীন দেব বর্মন তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বহু হিন্দি ফিল্মে সুনামের সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

খেলার জগতে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রাও ত্রিপুরার বাইরে তাঁদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত মণ্টু দেবনাথ, সোমদেব দেববর্মা ও দীপা কর্মকার। মহিলা জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার ২০১৬-র রিও অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করা ভারতের প্রথম মহিলা জিমন্যাস্ট যিনি বাহান্ন বছর পর অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেন এবং মহিলাদের প্রদুনোভা ভল্ট জিমন্যাস্টিকসে চতুর্থস্থান অধিকার করেন। ■

রিয়াং

জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত সরকার এদের রিয়াং নামে নথিভুক্ত করলেও এদের বসবাস প্রধানত উত্তর ত্রিপুরার ধলাই জেলায় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায়। ভাষা ককবরক। ত্রিপুরায় ত্রিপুরির পর এরাই বৃহত্তম জনজাতি। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরায় রিয়াংদের সংখ্যা ছিল ৬৪ হাজার ৭২২ জন। ২০০১-এ সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৬৫,১০৩ জন। রিয়াংদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে, মেসকা আর মলসোই।

কুকি

সাধারণত ডারলং এবং লুসাই জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে কুকি বলা হয়। ত্রিপুরার লুসাইরা জামপুই এবং শেকেল পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। তারা নিজেদের মিজো বলে, কারণ লুসাই শব্দে লু কথাটির মানে প্রধান এবং সাই কথাটির মানে শিকারি। এক সময় তারা প্রধান শিকারি নামে চিহ্নিত হলেও এখন সেটা রীতিবিরুদ্ধ। ত্রিপুরায় ১১, ৬৭৪ জন কুকি বসবাস করে। তাদের প্রধান জীবিকা ঝুম চাষ। বন্যপ্রাণী শিকারে এরা ওস্তাদ। যে-কোনও মাংস এরা খুশি মনে খেয়ে থাকে।

রবার চাষ।

ত্রিপুরার অর্থনীতিতে কৃষি

ড. নীলাদ্রি পাল

ভারতবর্ষের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা ১৯৪৯ সালে ভারতে সংযুক্ত হবার পর থেকেই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন রকমের ভারী ও মাঝারি শিল্প থেকে দূরে রয়েছে। পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার অর্থনীতি সর্বদা কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যাদির উপর নির্ভরশীল। ত্রিপুরার ভৌগোলিক আয়তনের (১০.৪৯১ লক্ষ হেক্টর) প্রায় ৭০ ভাগই পাহাড় ও টিলাজমিতে পরিণত। পাহাড়গুলির ঢাল অনেক বেশি খাঁড়া টিলাজমির ঢালের তুলনায়। ত্রিপুরার সর্ববৃহৎ পাঁচটি পাহাড়— বড়মুরা, আঠারমুরা, লংগতরাই, সাকান ও জম্পুই এবং অন্যান্য টিলাভূমিতে বিভিন্ন ধরনের বনজ সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছও বর্তমান। ত্রিপুরার ভৌগোলিক আয়তনের ৬০ শতাংশ জমি বনদপ্তরের আওতায়; সেখানে শাল, সেগুন, গামার-সহ প্রায় ৩৭৯ প্রজাতির বৃক্ষ, ৩২০ প্রজাতির গুল্ম, ৫৮১ প্রজাতির তৃণ, ১৬৫ প্রজাতির লতানো গাছ, ৩৫ ধরনের ফার্ন পাওয়া যায়। গ্রাম্য সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ত্রিপুরার বনজ সম্পদের লকড়ি, কাঠের আসবাব হিসেবে গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপুরার পাহাড়াঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ যেমন বরাক, মুলি, মৃত্তিঙ্গা ও বেত পাওয়া যায় যাকে বর্তমানে ন্যাশনাল বেম্বো মিশনের আওতায় এনে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত অনেকটা শক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের বনজ সম্পদ হতে রাজ্য সরকার গড়ে বছরে ১১-১২ কোটি টাকা আয় করে। রাজ্য সরকার বনের অধিকার আইনের আওতায় ১ লক্ষ বনবাসী পরিবারবর্গকে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমির পাট্টা বিলি করে সেখানে সুসংহত উপায়ে বন্যকৃষি (এগ্রোফরেস্টি) চালু করা হয়েছে।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সার্ভে অনুসারে ত্রিপুরার টিলা জমি চা, রবার, বিভিন্ন ফল চাষের জন্য উপযোগী। ত্রিপুরার টিলা ও মাঝারি ঢালযুক্ত জমিতে চা চাষ বহু পুরোনো। ১৯১৬ সালে কৈলাশহর জেলা বর্তমানে মহকুমাতে প্রথম চা চাষ শুরু হয়। ত্রিপুরার চা চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ হয় ১৯৭৯ সালের পর থেকে। বর্তমানে ত্রিপুরাতে প্রায় ৫৪টি বাগান সচ্ছল অবস্থায় আছে। এছাড়া প্রায় ২৭৭৩ জন ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। ২০টি চা

প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে সর্বমোট ৯.৭০ মিলিয়ন কেজি সিটিসি চা-উৎপাদিত হয়। ত্রিপুরার গড় ফলন (২০০ কেজি প্রতি ফালি) ভারতীয় গড় ফলন থেকে কম হলেও টি বোর্ড ও রাজ্য সরকার চা চাষিদের উন্নয়নের স্বার্থে নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে রবার চাষ শুরু হয় ১৯৭৬ সাল থেকে। সে সময়ে রবার চাষ সেরকম গুরুত্ব না পেলেও ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য ত্রিপুরাতে রবারের গুরুত্ব বাড়ে। কারণ চাষিরা ভাল দাম পেতে শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে মাত্র ৫৭৪ হেক্টর জমিতে প্রথম রবার চাষ শুরু হয় যা ২০০১-০২ সালে ৩০,৫৭৫ হেক্টর ও বর্তমানে ৭৪,৩৩৫ হেক্টর জমিতে পরিণত হয়েছে। রবার উৎপাদনে ত্রিপুরা এখন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় স্থানে। এই পরিমাণ বাগান হতে বছরে প্রায় ৫০,০০০ টন লেটেক্স তৈরি হয়। আগরতলাস্থিত রবার বোর্ড এই লেটেক্সের গুণগতমান পরীক্ষা ও মার্কেটিংয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কিছু রবার বাগান আছে। এছাড়া TFDPC ও TRPC নামক সরকারি অনুমোদিত সংস্থার মাধ্যমে রবার কাঠের বহুল ব্যবহার যেমন খাট-পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট,

বাঁশবাগান

দরজা ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রবার পার্ক আগরতলা শহর সন্নিকটে বোধজংনগর শিল্পাঙ্গনে অবস্থিত। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার অনুসারে একজন ক্ষুদ্র রবার চাষি বছরে ফালি প্রতি ৩০,০০০ টাকা লাভ করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের টিলা জমিতে রবার ও চা চাষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও সরকারি প্রয়াসে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান গড়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলির মতো ত্রিপুরাকে কাঁঠাল ও লেবুর 'সেন্টার অব অরিজিন' ধরা হয়। এখানে কাঁঠাল ও লেবুর প্রচুর প্রজাতি পাওয়া যায়। এছাড়া কুইন আনারসের প্রসিদ্ধি আন্তর্জাতিক মানের। জম্পুই পাহাড় কমলালেবু চাষে যেমন বিখ্যাত তেমনি তৈদু ও অম্পি মহকুমাও কমলা ও মুসাম্বি চাষে সচ্ছল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে সরকারি সাহায্য ও নিজস্ব চেষ্টায় ত্রিপুরাতে আম্রপালি আমের অনেক বাগান স্থাপিত হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রজাতির কলার মধ্যে সবরি সর্বোৎকৃষ্ট। সরকারি ভাবে টিসুকালচার পদ্ধতিতে রোগহীন কলার চারা তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য প্রজাতির মতো সবরিতে এই পদ্ধতির সুফল পাওয়া যায়নি। ত্রিপুরাতে বর্তমানে প্রায় ৯৭ হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান তৈরি হয়েছে, যার বেশিরভাগ অংশই পাট্টা চাষির জমিতে তৈরি।

ত্রিপুরার ৭০ ভাগ পাহাড় ও টিলাভূমি ব্যতীত বাকি ৩০ ভাগ জমি ঘনবসতিপূর্ণ ও চাষযোগ্য। এই চাষযোগ্য জমিতে মূলত বর্ষাকালীন ধান ও শীতকালীন সবজি, ডাল ও তৈলবীজ চাষ হয়ে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং এই লক্ষ্যে

গারো

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে ১২,৯৫২ জন (২০০১-র জনগণনা অনুযায়ী) গারো জনজাতির মানুষ বসবাস করেন। এদের একটা বড়ো অংশ খ্রিস্টান। তবে এখনও কেউ কেউ গারোদের প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি সংসারেকের অনুসারী। বস্তুত গারোরা সংসারেক নামেই পরিচিত। ডাকবেওয়াল এদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২০০৩ সালে ঋষি জিমলা নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র সংসারেক মতানুসারীদের রক্ষা করার জন্য। খ্রিস্টান আগ্রাসন থেকে গারো ধর্মকে বাঁচানোর জন্য সংগঠনটি কাজ করছে।

মগ

মগ জনজাতির মানুষ ত্রিপুরার দক্ষিণে বসবাস করেন। ২০০১-র জনগণনা অনুযায়ী ৩০, ৩৮৫ জন মগ ত্রিপুরায় আছেন। এরা বলেন, এদের আদি বাসস্থান আরাকান, বর্মা এবং চীনে। এদের নিজস্ব ভাষা আছে। প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এদের প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এদের বিশেষ উৎসব হয়। সকলে মিলে নতুন বছরকে আহ্বান করেন। প্রত্যেক বাড়িতে কেক তৈরি হয়। এদিন কেক খাওয়ার রীতি আছে।

কৃষি দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আংশিক সফল পালক হলো 'শ্রী' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রায় একচতুর্থাংশ বীজ ব্যবহারে ফালি প্রতি প্রায় ২০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি পায়। ত্রিপুরার প্রায় ২.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বর্ষাকালীন ধান চাষ করা হয়। এছাড়া জুম ফসল হিসাবে ৪৫০০ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হয়। বর্তমানে কৃষকরা বিভিন্ন উচ্চফলনশীল বীজ যেমন সোনামাসুরী, গোমতী, সি আর ধান প্রভৃতি শ্রী পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে বছরে গড়ে ৭ লক্ষ মেট্রিকটন চাল উৎপন্ন হয় যা ত্রিপুরার বাৎসরিক প্রয়োজনীয়তার প্রায় ৮০ শতাংশ পূরণ করে। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ২টি আধুনিক ধানের মিল তৈরি হওয়ায় ত্রিপুরার চালের গুণগতমান ঠিক থাকে যার ফলে কৃষকরা ভাল লাভ পায়। বর্ষাকালীন ধানের মতো শীতকালীন ধান ত্রিপুরা রাজ্যের খুব কম অংশেই হয়। কৃষিদপ্তর শীতকালীন ধানচাষের পরিবর্তে ডাল

কাঁঠাল চাষ।

ও তৈলবীজ চাষে গুরুত্ব আরোপ করছে। ত্রিপুরায় মূলত মুগ, মুসুর, কলাই, ছোলা, অড়হড়, তিল, সরিষা ও চীনাবাদাম চাষে সরকারি সাহায্য কৃষকদের দেওয়া হয়।

বর্ষাকালীন ধানচাষের পর সেচযুক্ত জমিতে কৃষকরা শীতকালীন সবজি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, ঢেঁড়স, মুলা, শশা, বেগুন, গাজর ইত্যাদি চাষ করে যার ভাল বাজারমূল্যও পায়।

TPS আলু উৎপাদনে ত্রিপুরার সুখ্যাতি ভারতবর্ষ জুড়ে। বর্তমানে রেজিস্টার গ্রোয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে বীজ আলু তৈরি হয়। এছাড়া এই প্রোগ্রামের ফলে ত্রিপুরা এখন ধান, ডাল ও তৈলবীজের উন্নত ধরনের বীজে পরিপূর্ণ, এখন আর বহিঃরাজ্য থেকে বীজ আনতে হয় না।

ভারতবর্ষের জিডিপিতে স্বাধীনতার সময়ে কৃষির অংশীদারিত্ব ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ যা বর্তমানে কমে প্রায় ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু ত্রিপুরার মতো প্রান্তিক রাজ্যে শুধুমাত্র কৃষির অংশিদারিত্ব প্রায় ২৬ শতাংশ আর কৃষি, উদ্যান, পশুপালন, মাছ ও বনজসম্পদ মিলে প্রায় ৩২ শতাংশ। এই বিরাট অংশীদারিত্বের কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকের কৃষিজ গড় আয় হলো ৬৫১১৭ টাকা যা ভারতবর্ষের গড় আয়ের তুলনায় মাত্র ১৬ শতাংশ কম। কৃষিজ গড় আয়ের নিরিখে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো রাজ্যকে পেছনে ফেলে দিলেও উদ্যানজাত চাষের দৌলতে মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ের মতো রাজ্যের আয় ত্রিপুরার তুলনায় অনেক বেশি। ■

উপযুক্ত জবাব দিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে হবে

অতিথি কলম

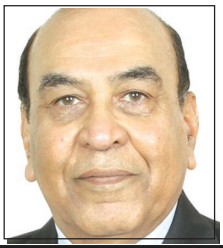

সৈয়দ আটা হাসনাইন

পাকিস্তানের নিরন্তর মিথ্যে প্রচার আর ভারতের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার বিষয়টা হলো একটি পুরো সময়ের চাকরি, বিশেষত প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুটি যদি হয় ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়। আর ঘটনা হলো এ বিষয়ে ভারতের দুর্বলতাই পাকিস্তানের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণের বড় কারণ।

পাকিস্তানি 'ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন' (আইএসপিআর)- এর তরফে মার্চ ২০১০ সালের একটি সন্দেহজনক সংবাদ প্রতিবেদন সম্প্রতি নতুন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে চাউর করা হয়েছে। বাস্তবে এটি একটি আদ্যন্ত কু'-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পাকিস্তানি আইএসপিআর-এর অপপ্রচার। আমাদের দেশে খুব কম লোকই এই বিষয়টা জানে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের যোগদান কী পর্যায়ের আর তাদের আনুগত্যের প্রশ্নটা কত শতাংশ সন্দেহাতীত? এমন একটা মুখরোচক বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে সহজেই বোকা বানানো যেতে পারে। এই সূত্র ধরেই পাকিস্তানের মিথ্যে প্রচারের উৎসমুখে যাওয়া যায়। তারা ঢাক পেটাচ্ছে ১৯৬৫ সাল অবধি নাকি ভারতে একটি মুসলিম রেজিমেন্ট ছিল। এর পরই চরম ভয়ঙ্কর কথাটি তারা অকাতরে বলে বেড়াচ্ছে যে ২০ হাজার মুসলমান সৈন্য নাকি ১৯৬৫-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করে। এই কারণেই তখন থেকে ভারতের মুসলিম রেজিমেন্ট তুলে দেওয়া হয়। আরও আছে! ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা যে তুমুল লড়াই করে জয় হাসিল করেছিল সে যুদ্ধেও কোনও মুসলমান অংশগ্রহণ করেনি। অর্থাৎ এটিও সমপর্যায়েরই একটি মিথ্যে।

ওই প্রচার অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যা তাদের জাতীয় জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক কম। আদতে ২০১০ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণারত, একজন ভারতীয় মুসলমানের করা একটি সমীক্ষার বিশেষভাবে নির্বাচিত কিছু অংশ। গবেষক কিন্তু এই ঘটনাটিকে আদৌ অযৌক্তিক বা বাহিনীতে ধর্মীয় সংরক্ষণ না রাখার বিষয়ে কোনও বৈষম্যমূলক দিক নির্দেশ করেননি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই ধরনের পরিকল্পনা কিন্তু বাস্তবে সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ পদমর্যাদাধারী মুসলমান সৈনিক ও সাধারণ সেনা উভয়েই পাকিস্তানে চলে যায়। অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক যে মুসলমান সৈনিক ভারতে থেকে যায় তাদের বাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই একই মাপকাঠিতে এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সংখ্যার নিরিখে তো বটেই ধর্মের ভিত্তিতে ভারতে কোনও রেজিমেন্ট কখনও তৈরি হয়নি। এর মূল ভিত্তি ছিল জাতিগত পরিচয় যেমন শিখ, রাজস্থানি, গোর্খা বা গাড়োয়াল রেজিমেন্টের গঠন এই স্থানিক পরিচয়েই হয়। তবে এই সমস্ত ইউনিটের মধ্যে ছোট ছোট সাব ইউনিট হিসেবে আলাদাভাবে মুসলমানদের অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়।

তাই ভারতে কস্মিনকালেও কোনও মুসলমান রেজিমেন্ট ছিল না আর ১৯৬৫ সালে তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিভিন্ন রেজিমেন্টের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানরা কখনই তাদের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখায়নি। আবদুল হামিদ তাঁর বীরত্বের সম্মানে সর্বোচ্চ পরমবীরচক্র পেয়েছেন। যদিও তাঁর নাম সেইভাবে আজকাল শোনা যায় না। লেফট্যানেন্ট জেনারেল মহম্মদ জাকি ও মেজর আবদুল রফি খাঁ দু'জনেই বীরচক্র পদক পেয়েছিলেন, এর মধ্যে রফির সম্মান ছিল

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

মরণোত্তর। রফির লড়াইয়ের ঘটনাটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। '৬৫-এর যুদ্ধে আবদুল রফি দুর্দান্ত লড়াই দিয়েছিলেন তাঁরই কাকা পাকিস্তানি একটি ডিভিসন পরিচালনা করা মেজর জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের বিরুদ্ধে। সে যুদ্ধে রফি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৬৫-র যুদ্ধে এমনই সব বিজয়গাথা লোকের মুখে মুখে ঘুরত। মুসলমানদের নির্ভীক অংশগ্রহণের একটি কাহিনির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ১৯৭১-এর যুদ্ধেও। পরবর্তী সময়ে মুসলমান সৈনিকরা কারগিল যুদ্ধে ও জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করে চলেছেন। প্রসঙ্গত তিনজন আর্মি কম্যান্ডার, তিনজন কোর কম্যান্ডার এবং বেশ কয়েকজন ২টি করে তারকা খচিত জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে মুসলমান সৈনিকরা সম্মাননীয় অবদান রেখেছেন। পাকিস্তানের ঘৃণ্য প্রচার রুখতে গেলে নাগরিকদের অন্তত দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করা দরকার। প্রথমটি অফিসার র‍্যাঙ্কের বিষয়ে। সেনাবাহিনীর পরিভাষায় একজন কমিশনড্ অফিসার জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোনও রেজিমেন্টে বদলি হতে পারেন ও নেতৃত্বও দিতে পারেন। তিনি তাঁর জাতিগত পরিচয় নিরপেক্ষভাবে 'অল ইন্ডিয়া অল ক্লাস' বাহিনীর বা কোন রেজিমেন্টের আওতায় থাকা কোন সাবইউনিট তা সে যে কোনো জাতিগত পরিচয়েরই হোক না কেন তারও নেতৃত্ব দিতে পারেন।

আমি সরাসরি নিজের কথা বলছি— আমি একজন মুসলমান কমিশনড অফিসার হিসেবে গাড়োয়াল রাইফেল যা কিনা একশো ভাগ হিন্দু রেজিমেন্ট শুধু নয়, যে রেজিমেন্টে নিয়োগও শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডেই হতো সেখানে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সহজ কথায় শুনে রাখুন, আমার অধীনস্থ বাহিনীর বিশ্বাসই ছিল আমার বিশ্বাস আর সেই একইভাবে তাদের সংস্কৃতি, তাদের ভাষা তাদের সঙ্গে গড়ে ওঠা খাদ্যাভ্যাস এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। ভারতের সেনা আধিকারিকরা নিজেদের এমন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। একই কথা তাঁদের পরিবারের সম্পর্কেও বলা যায়। এটি বিশেষ ধরনের মানসিকতা যা বহু সাধারণ ভারতীয় বুঝে উঠতে পারে না সেক্ষেত্রে পাকিস্তানিরা কী বুঝবে? তারা তো জীবনে কখনও নিজ ধর্মবিশ্বাসের বাইরে অন্য কোনও লোকের সঙ্গে না বসেছে এক বেঞ্চে, না খেয়েছে এক টিফিন বাক্সের খাবার।

হ্যাঁ, অফিসার পদমর্যাদার নীচের দিকে বাহিনীতে লোক নিয়োগটা অন্যরকম। প্রত্যেক রাজ্যের সামাজিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট প্রবণতা আছে। একে রিক্রুইটেবল মেল পপুলেশন (আর এম পি) ইনডেক্স বলে। এই সূচকটিতে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও মূলত পুরুষ জনসংখ্যার বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। অবশ্যই ধর্মবিশ্বাস, শ্রেণী, বর্ণ বা বিশেষ জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে এখানে কোনও সংরক্ষণ হয় না। অবশ্যই, ভারতের মতো এমন বিচিত্র জনগোষ্ঠী- সমন্বিত সমাজে কখনই বাহিনীর জাতিগত সংখ্যাভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় না। কেননা সেক্ষেত্রে দেশের সেনার মধ্যে পারস্পরিক যে অসাধারণ সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ আছে তা নষ্ট হওয়ার অবকাশ থেকে যায়। একথা গোপন করার কোনও কারণ নেই যে বাহিনীতে কর্মরত মুসলমান অফিসার ও সাধারণ সৈনিকের সংখ্যা তাদের সামগ্রিক জনসংখ্যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সমানুপাতিক নয়। কিন্তু সেই ফারাকটা কমিয়ে আনা একটি সদা-সচল প্রক্রিয়া যা বিশেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন ও মানসিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটলেই এখানেও বৃদ্ধি ঘটবে।

বিশেষ করে অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাটা একেবারে সর্বজনীন হয়। যে অঞ্চলে শিক্ষার ভিত যত শক্ত এবং মানসিক সচেতনতা যত বেশি সেখানে জনসংখ্যার ভাল অংশ স্বাভাবিকভাবে বেশি সফল হয়। এই সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের এখনও অনেক কিছু করার রয়েছে। নাগরিকদের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার বিষয়টা মহাগুরুত্বপূর্ণ। আমার বিভিন্ন শিক্ষাদান সংক্রান্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় দেখেছি বহুক্ষেত্রে মুসলমানরা হতবাক হয়ে প্রশ্ন করছে— সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কি বিবেচিত হতে পারে? এই সূত্রে আমার নিজের পরিবারে যেখানে বাবা ও ছেলে দু'জনেই সেনাবাহিনীতে জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করেছিল এটাও তারা বিশ্বাস করতে চায় না। এই মানসিক দৈন্যটাই পাকিস্তান ভাঙিয়ে খেতে চায়। এর সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের আরও একটি চরম ভ্রান্ত সংস্কার যোগ হয় যে বাহিনীতে যোগ দিলে তারা তাদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাসকে অনুশীলন করতে পারবে না। ভারতের বহুমুখী সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের উৎকর্ষভূমি হলো ভারতের সেনাবাহিনী। সেখানে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ থাকলেও সে সুসংবাদ যে তৃণমূল স্তরে নিয়োগ পদ্ধতি শুরু হয় সেখানে পৌঁছনোয় ঘাটতি থেকে যায়।

এই কারণেই পাকিস্তান কত সহজে তাদের আইএসপিআর-এর মাধ্যমে নিখাদ অপপ্রচারে নন-ইস্যুকে ইস্যু করে ভারতের বদনাম করে যায়। জনগণের মধ্যে সেনাবাহিনীতে কী সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত পরিবেশ বিরাজ করে তা প্রচার-প্রসারে আমাদের নিরন্তর ব্যর্থতাই পাকিস্তানকে অন্যায় মিথ্যে সুযোগ করে দিচ্ছে। এর পরিবর্তন করে মুসলমান ধর্মগুরুদের মধ্যেও প্রকৃত অবস্থার প্রচার আশু কর্তব্য।

(লেখক ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত থ্রিস্টার জেনারেল)

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

বাংলার নবজাগরণে পদ্মিনী উপাখ্যান

ড. জিষ্ণু বসু

আলাউদ্দিন খিলজি দিল্লির নিষ্ঠুরতম পাঠান সুলতান। নিজের চাচা জালালুদ্দিন খিলজিকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিন চাচা জালালুদ্দিনের মেয়েকেই বিয়ে করেন। মালিকা-ই-জাহানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরেই আলাউদ্দিন বোঝেন যে বিবাহের পবিত্র বন্ধন তার জন্য নয়। বছরখানেকের মধ্যেই মাহরু নামের একটি মেয়েকে তার স্ত্রীর সামনেই উপভোগ করেন। ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক ফারিস্তার মতে আলাউদ্দিনের এই ধরনের নোংরা জীবনযাত্রা পাঠানদের মতো পার্বত্য উপজাতিদের কাছেও অসহ্য ছিল। তাই স্ত্রী মালিকা ও শাশুড়ি সুলতান জালালুদ্দিনের কাছে অভিযোগ করেন। চতুর আলাউদ্দিন নিজের স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপনের অভিপ্রায়ে বেরিয়ে পড়েন। আলাউদ্দিনের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের সামস্যাবহুল কাহিনি হাজি-উদ-দাবির লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রাজ্য জয়ে বের হয়ে প্রথমে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্য দখল করেন আলাউদ্দিন। দাক্ষিণাত্যের মানুষ প্রথম জীবন্ত নরপিশাচকে দেখল। সোনা-দানা, ধনরত্ন, হাতি, ঘোড়া তো বটেই বিজিত রাজ্যের মেয়েদেরও যে পণ্যের মতো নিয়ে যাওয়া যায় সেই বীভৎসতা প্রথম প্রত্যক্ষ করল দেবগিরি। সালটা কমবেশি ১২৯৬। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের কাছ থেকে আলাউদ্দিন কেড়ে নিলেন তার আদরের কন্যা ঝাত্যাপালিকে। সেই শুরু। এরপর একের পর এক হিন্দু রাজ্য দখলের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কশায়িনী করেছেন সেখানকার রাজপরিবারের মেয়েদের। সে রাজকন্যা ঝাত্যাপালিই হোন আর গুজরাটের রাজবধূ কমলাই হোন। তার হারেম সর্বদা সুন্দরী যুবতী নারীতে পূর্ণ থাকলেও আলাউদ্দিনের যৌনতৃষ্ণা কখনো মেটেনি। দেবগিরির রাজকন্যাকে ভোগ করে রাজ্যের প্রভূত

ধনরত্ন, মূল্যবান ধাতু, দাসি রত্ন, রেশমের বস্ত্রাদি, হাতি আর ঘোড়া নিয়ে যখন আলাউদ্দিন কারার দিকে রওনা হলেন তখন সেই লুঠের গনিমতের মালের সঙ্গে শিকলে বাঁধা সারি সারি হিন্দু যুবতীও ছিল। সেই গনিমতের মালের ভাগ পেতে সুলতান জালাউদ্দিন গোয়ালিয়র পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন সে পথে পা বাড়ালেন না। তিনি লুঠের সব মাল নিয়ে কারাতে চলে গেলেন। কারাতে পৌঁছে ধূর্ত আলাউদ্দিন মোক্ষম চাল দিলেন। তিনি সুলতানের কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখলেন। জালাউদ্দিন ক্ষমা করে তৎক্ষণাৎ পত্র পাঠালেন। জালাউদ্দিনের দূত কারাতে এসে আলাউদ্দিনের সৈন্য সম্ভার দেখে বুঝল শয়তানের আসল পরিকল্পনা। কিন্তু আলাউদ্দিন তাদের আর ফিরতে দিলেন না। কারাতেই আটকে রাখলেন। বরং ভাই আলমাস বেগকে (উল্লুহ্ খান) পাঠিয়ে জালাউদ্দিনকে ভুল বুঝিয়ে কারাতে নিয়ে এলেন। কারাতে ঢোকার ঠিক মুখে ১২৯৬ সালের ২০ জুলাই গঙ্গাবক্ষে জালালুদ্দিনকে অভ্যর্থনার ভান করে খুন করলেন আলাউদ্দিন। জালালুদ্দিনের সেই ছিন্ন মস্তক একটি বল্লমের মাথায় গেঁথে তার সারা শিবির ঘোরালেন আলাউদ্দিন, তারপর আওধে পাঠিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিক বাণারসী প্রসাদ সাকসেনা তার 'এ কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : দ্য দিল্লি সুলতানেত' গ্রন্থে এমনই এক পাশবিক চরিত্রের মানুষ রূপে দেখিয়েছেন আলাউদ্দিন খিলজিকে।

মজার ব্যাপার হলো, আলাউদ্দিনের মৃত্যুর২২৪ বছর পরে সুফি কবি মালিক মহম্মদ জাইসি তাকে এক অসাধারণ রোমান্টিক নায়করূপে দেখিয়ে কাব্যগ্রন্থ লিখলেন। 'পদ্মাবত' কাব্যের পটভূমি রাজস্থানের চিতোর এবং সময়কাল আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের বছর। জাইসি চিতোরের লোক নন, রাজস্থানেও কখনো থাকেননি। জাইসির কবর আমেথিতে। তাই স্থানীয় লোককথা শুনে তিনি 'পদ্মাবত' লিখেছেন, এমন সুযোগও নেই। তাই জাইসির লেখা সম্পূর্ণ দূর থেকে শোনা বহুপুরাতন এক কাহিনির উপর তৈরি এক কষ্টকল্পনা। সুফি কবি বা সুফি নাম শুনলেই অনেকের মনে এক ভ্রান্ত ছবি ভাসে। মানবতাবাদী, উদারপন্থী, দয়ালু, পরমতসহিষ্ণু এক সন্ত ফকিরের চেহারা। সব সুফি মোটেই এমন ছিলেন না। বাংলার মানুষ দুই সুফির কীর্তি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে, শিক্ষা নিয়েছে। সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা গৌরগোবিন্দকে অন্যায় ভাবে পরাস্ত ও হত্যা করার চক্রান্ত একা এক সুফি ফকির শাহ্ জালালের। খ্রিস্টীয় ১৩০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সিলেটে আসেন তিনি। সদা সহিষ্ণু হিন্দু সমাজ, প্রজাবৎসল রাজা গৌরগোবিন্দ সুদূর আরবদেশের ইয়েমেন থেকে আসা এই ফকিরকে সরল মনে থাকতে দিয়েছিলেন, ডেরা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। সুরমা নদীর ধার থেকে অতি গোপন পথ দিয়ে আক্রমণকারী সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহকে এনে তার আশ্রয়দাতা গৌরগোবিন্দকে পরাস্ত করান এই সুফি ফকির। আরেক সুফি ছিলেন পরাধীন ভারতের ভয়ঙ্করতম নরহত্যার নায়ক হুসেন সইদ সুরাবর্দি। ১৯৪৬ সালের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর কথা আজ সারা পৃথিবীর নরহত্যার বীভৎসতম ইতিহাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অখণ্ড বাংলার এই জল্লাদ প্রধানমন্ত্রীও

সুরাবর্দিয়া মহজবের সুফি। তাই মালিক মহম্মদ জাইসির লেখাকে কোনো মহাত্মা সুফি সন্তের ঐশ্বরিক ব্যাখ্যান হিসেবে কোনো বঙ্গভাষী বিদ্বজ্জন মনে করবেন না।

১৬৬৯ সাল নাগাদ ফরিদপুরের সইদ আলাউল জাইসির 'পদ্মাবত' কাব্যের বাংলা ভাবানুবাদ করেন। কাব্যগ্রন্থের নাম দেন পদ্মাবতী। আধুনিক সমালোচকদের মতে আলাউলের রচনা জাইসির মতো এতো উগ্র ধর্মনির্ভর ছিল না, বরং অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ আর মানবিক। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ২০১৪ সালে 'আলাউল' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছে। লেখক ওয়াকিল আহমেদ। আহমেদ সাহেবের মতে জাইসির 'পদ্মাবত' ধর্মীয় অতিলৌকিকতা ও সুফিতত্ত্বে ভরা, সেই তুলনায় আলাউলের কাব্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক ভালোবাসার উপাখ্যান। তাই ওই অত যুগ আগেও জাইসির বক্তব্য বা মতকে বাংলার মানুষ সহজ সত্য বলে মেনে নেয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাজস্থানকে ভালোবেসে ফেললেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিক এক প্রাচ্যবিদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেমস টড। তিনি ১৭৯৯ সালে ইংল্যান্ড ছেড়ে বেঙ্গল আর্মির অফিসার হলেন। ধীরে ধীরে এই মানুষটি এক সংবেদনশীল ভারতবিদ হয়ে উঠলেন। রাজস্থানের দুর্গে দুর্গে, জনপদে জনপদে ঘুরে ঘুরে, লোকগাথা শুনে বুঝে তিনি তৈরি করলেন এক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই কাজে তাঁকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন তার জৈন গুরু জ্যোতি জ্ঞানানন্দ। ১৮২৯ সালে লন্ডনের রওটেল্ডার অ্যান্ড কেগান পল লি. থেকে প্রকাশিত হলো টডের অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল, 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকস অব রাজস্থান'। বিভিন্ন রাজবংশ, বিভিন্ন রাজত্বের উত্থান-পতনের গাথার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের প্রসঙ্গ এসেছে। টড এড়িয়ে যাননি রানি পদ্মাবতীর প্রসঙ্গও। অসাধারণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন রানি পদ্মিনীর (পদ্মাবতীর অন্য নাম) মানসিকতা ও আক্রমণকারীদের বীভৎসতা : ''তাতারদের লালসা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে অপরূপা সুন্দরী পদ্মিনীকে ঘিরে সমবেত হলো যত পুরনারী। রানি তাদের নিয়ে মাটির নীচে এক গুহার মতো স্থানে প্রবেশ করলেন। বন্ধ করে দেওয়া হলো সেই প্রকষ্ঠের দ্বার। ওই বীভৎস ক্ষুধার্ত নারীলোলুপ আক্রমকদের হাতে অপমানিতা ধর্ষিতা হওয়ার থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ছিল সেটাই।''

জেমস টডের এই লেখা সেযুগের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫৫ সালে সদ্য প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটের সহ-সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন রঙ্গলাল। মাসিক পত্রিকা রসসাগর প্রকাশ শুরু করলেন তিনি, পরে তার নাম হলো সংবাদ সাগর। পরবর্তীকালে একটি সাপ্তাহিক পত্র 'বার্তাবহ'ও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। জেমস টডের রাজস্থানের গাথা তাকে স্পর্শ করেছিল। সেই প্রেরণা থেকেই তিনি 'পদ্মাবতী উপাখ্যান' লিখলেন। বইয়ের প্রচ্ছদে লেখা হলো 'রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ'। রঙ্গলাল ভূমিকায় বলেছেন, 'আমি উভয়োক্ত মহাত্মার অনুরোধে কর্নেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।' পদ্মিনীর মানসিকতা, সৎগুণ এবং অত্যাচারী আলাউদ্দিনের প্রতি তার মনোভাব অকপটে বর্ণনা করেছেন রঙ্গলাল, পদ্মিনীকে একবার দেখতে চেয়েছেন আলাউদ্দিন।

''সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী
একথা তাহারে কবে কোন মূঢ়মতি।''

অথবা পদ্মিনী প্রদর্শনের এই অংশটি,

''পদ্মিনী সুশীলা সতী, পতিব্রতা, পুণ্যবতী
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রকুলে
অতি ধন মনে মনে গনি
পতিরূপ ধনে ধনী ধনি।''

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পদ্মাবতীর মাধ্যমে তিনি দেশাত্মবোধ জাগরণের চেষ্টা করেছেন। তার পদ্মিনী ক্রমে হয়ে উঠেছেন দেশের জন্য ত্যাগ, স্বাভিমান আর সম্মানের প্রতীক। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' বিখ্যাত দুটি পঙক্তি—

''স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

এই অসাধারণ পঙক্তি দুটি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মনে বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। আলাউদ্দিনের নিষ্ঠুরতার কাছে আপোশহীন ভাবে পদ্মিনীর সম্মান, ইজ্জত ও মর্যাদার লড়াইকে সে যুগের দেশপ্রেমিকরা বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত একজন আই সি এস ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে সরকারি কাজ থেকে অবসর নেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে লন্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো শুরু করেন। সেই সময় অর্থনৈতিক রাষ্ট্রবাদের উপর তার বিখ্যাত পিএইচডি থিসিস প্রকাশিত হয়। সম্ভবত দেশপ্রেম থেকেই রমেশচন্দ্র বাংলাভাষাতে লেখা শুরু করেন। পরে রামায়ণ, মহাভারতেরও অনুবাদ করেন। তার লেখা প্রথম পুস্তক 'মাধবীকঙ্কন' তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। তার মুখবন্ধে লেখেন :

''প্রিয় সুহৃৎ সুরেন্দ্র,

নয় বৎসর গত হইল, তুমি, সুহৃদবর বিহারীলাল ও আমি এই তিনজনে একদিন প্রাতঃকালে মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া একত্রে, একই উদ্দেশ্যে বহু সমুদ্র পার বিদেশ-যাত্রা করিয়াছিলাম। ...অদ্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্যে ব্রতী হইয়াছি। তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎ কার্যে সফল হও। এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।''

বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রত গ্রহণ করেছেন। বাংলায় প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লিখলে দেশাত্মবোধ জাগরিত হবে, সেটাই হয়তো ছিল রমেশচন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'

নামে দুটি অসাধারণ গ্রন্থ লেখেন। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় স্বাভাবিক ভাবে এসেছে আলাউদ্দিনের কথা, তার অত্যাচারের কাহিনি :

''প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে আর একজন দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন আর একবার চিতোর লইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর শিশোদিয়ার কণ্ঠমণি চিতোর তুর্কি হস্তে কতদিন থাকে? সেবার হাম্বির এই কণ্ঠরত্ন তুর্কিদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। এবার প্রতাপ সিংহ লইবেন।''

চতুর্বিংশ পরিচ্ছদে 'ভীমগড় ধ্বংসের' বর্ণনাতে তিনি জহরব্রতের বেদনাবিধুর চিত্র তুলে ধরেছেন :

''পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্যবদনে কহিলেন— সখীগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামী সোহাগিনী হইব। ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কী সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কিগণ দেখুক। রাজপুত যোদ্ধগণ বীর, রাজপুত রমণীগণ সতী।''

''নবোদিত সূর্যালোকে সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন। দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রিত হইলেন, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর? তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম অনুসারে অলঙ্কার-বিভূষিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্মনাশ অনিবার্য হয়, রাজপুত রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন।''

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'কথা ও কাহিনি' কাব্যগ্রন্থে একটি অসামান্য কবিতা সংযোজন করেন। কবিতার নাম 'হোরি খেলা'। কবিতার মূখ্য চরিত্রগুলির নাম অবশ্য এক পাঠান সুলতান কেশর খান এবং কেতুনগড়ের রাজা ভূনাগের রাঙ্গী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিতার স্থান রাজস্থান বললেও ঘটনাটি আলাউদ্দিন ও পদ্মিনীর ঘটনার খুব কাছাকাছি। কবি এখানে পদ্মিনীকে কিছুটা সুবিচার, পরিভাষায় বললে 'পোয়েটিক জাস্টিস' পাইয়ে দিয়েছেন। এখানে রানি রাজপুতানীর পোশাকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের নিয়ে গিয়েছিলেন পাঠানপতির সঙ্গে হোলি খেলতে। এমনই ছলনার শেষে হঠাৎ রানি তার হাতের ভারী কাঁসার থালাটি সুলতানের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। করিগুরুর ভাষায়, ''পাঠানপতির ললাটে সহসা/ মারেন রানি কাঁসার থালাখানা। রক্তধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে/ পাঠানপতির চক্ষু কানা।।'' কবিতার শেষ লাইন দুটি খুবই অর্থবহ, ''যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল। সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।।''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'রাঙাকাকা' রবিঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা যেন অনেকটাই সঞ্চারিত হয়েছিল অবন ঠাকুরের মধ্যে। তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর মতো যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। চিত্রকলাতে স্বদেশী ভাবনা এনে বলিষ্ঠ ঘরানা তৈরি করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির এই মনীষী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে প্রথম ভারতমাতার চিত্র আঁকলেন। গৈরিকবসনা হিন্দু দেবী। এক হাতে ধানগাছ, একহাতে মালা, একহাতে বেদাদি গ্রন্থ আর অন্যটিতে জপমালা। এই চিত্র দেখে অভিভূত হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা চেয়েছিলেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী গ্রামে-শহরে সর্বত্র দেখানো হোক এই ভারতমাতার রূপ। যদি জাগরিত হয় সুপ্ত দেশ। অবন ঠাকুর এক অসাধারণ কথাসাহিত্যিকও ছিলেন। বিশেষত শিশু সাহিত্যে। নালক, বুড়ো আংলা, শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল একেকটি যেন লাবণ্যের খনি। সেযুগে সমালোচকরা বলতেন অবন ঠাকুর 'গল্প লেখেন না গল্প আঁকেন।' অবন ঠাকুরের আর একটি কালজয়ী গ্রন্থ রাজকাহিনি। রাজস্থানের রাজপুতদের গাথা। এই রাজকাহিনির একটি হলো পদ্মিনী। নারী লোলুপ আলাউদ্দিনের কামনার আগুনে জল ঢেলে দিয়েছিল রাজপুত স্বাভিমান। একজন নারীর জন্য একটা জাতি যে নিজেদের শেষ করে দিতে পারে সেটি পাঠান সুলতানের ধারণায় ছিল না। অবন ঠাকুরের ভাষায়, ''আল্লাউদ্দিন ভেবেছিলেন— যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব, কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিকে যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নীচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।''

রানির সঙ্গে রাজপুত সর্দারদের পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক অপরূপ ছবি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। রাজপুত সর্দারদের বৈঠকে সর্বসম্মতি ভাবে ঠিক হলো যে কোনোমতেই ওই নরপিশাচের হাতে পদ্মিনীকে দেওয়া হবে না : ''তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত-সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান। পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদের রানিও বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীসুদ্ধ লোক বলবে রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানার হয়ে লড়ে? ...রাজসভা ভঙ্গ হলো। সেই সময় রাজসভার এক পারে শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লালা রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারদের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রানির জয়!' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।'' ঠিক তেমনই রানাকে আলাউদ্দিনের কারাগার থেকে ফিরিয়ে এনে সিংহদ্বারের যুদ্ধে যখন প্রাণ দিলেন রানা-রাজ্ঞীর একান্ত অনুগত সর্দার গোরা, সেই দৃশ্যের বর্ণনা ও অসাধারণ বেদনাবিধুর।

''সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধশেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন। তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?'' রানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ''পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে দেবলোকে চলে গেছে। দুজনের আর একটিও কথা হলো না। রানি পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার

করে দিলেন, দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায়-হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।"

আলাউদ্দিনের নিষ্ঠুরতা বোঝাতে অবনীন্দ্রনাথ একটি অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। ''তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন। মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মতো এক জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপর একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একটি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ছটফট করছে। তিনি শিস দিয়ে বাজ-পাখিকে ফিরে ডাকলেন। পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল, আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। আর সেই তোতাপাখির জোড়া পাখিটা প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল। শেষে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোট খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতীও এসে আপনি ধরা দিয়েছে।' আলাউদ্দিন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলছিলেন, হঠাৎ ওমরাহোর মুখে ওই কথা শুনে তাঁর মনে হলো— যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানি পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন!"

এই নিষ্ঠুর আলাউদ্দিনের প্রতি রানি পদ্মিনীর কী গভীর ঘৃণা ছিল তা আয়নাতে তার প্রতিবিম্ব দেখে নারীলোলুপ পাঠান সুলতানের ছুটে আসায় প্রকাশ পেয়েছে :

''রাগে রানির দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা, সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে ছুঁড়ে মারলেন— ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আলাউদ্দিন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন।"

আলাউদ্দিন-পদ্মিনী প্রসঙ্গে আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম উপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা না বললে সম্পূর্ণ হবে না। সত্যসন্ধানী বোমকেশ চরিত্রের স্রষ্টা শরদিন্দু কিছু কালজয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। এরমধ্যে শঙ্খ-কঙ্কণ বহু প্রশংসিত একটি লেখা। শঙ্খ-কঙ্কণের প্রথম আবর্তের একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখক আলাউদ্দিনকে চেনাচ্ছেন :

''দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন বেশিদূর অগ্রসর হন নাই। দেবগিরি রাজ্য ছলনার দ্বারা জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে সুন্দরী যুবতীর অভাব ছিল না, তবু তিনি গুজরাটের রানি কমলাকে কাড়িয়া আনিয়া নিজের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন।

সুন্দরী নারী রাজরানী হোক বা পথের ভিখারিণী হোক, আলাউদ্দিনের চোখে পড়িলে আর তার নিস্তার নাই। তিনি একবার চিতোরের পদ্মিনীর দিকেও হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেই জ্বলন্ত অনলশিখাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। নারী-বিজয় ক্ষেত্রে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিনের ইহাই একমাত্র ব্যর্থতা।"

ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাণ্ডারি ছিল বাংলা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবন ঠাকুর বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তারা পশ্চিমি যুক্তিবোধ দিয়ে স্বদেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, অতীতের লজ্জা দুঃখের কথা বলেছেন, যাতে সচেতন সমাজ একই ভুল আর না করে। দেবগিরির ঝাত্যাপালি কিংবা গুজরাটের রানি কমলা বাধ্য হয়েই আলাউদ্দিনের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। কেউই তাকে ভালোবাসেননি। আলাউদ্দিন-পদ্মিনীর রোমান্টিক কাব্যকাহিনি লিখে মালিক-মহম্মদ জাইসি হিন্দুদের কলঙ্কজনক পরাজয়, অপমানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে চেয়েছিলেন। আজ আলাউদ্দিন-পদ্মিনীকে নিয়ে ছায়াছবি করতে হলে সেটা স্টিভেন স্পিলবার্গের স্লিন্ডলার্স লিস্টের মতো নরসংহারের চলচ্চিত্র তৈরি করতে হবে সেটা কোনো মতেই রোমান্টিক ছবি হবে না। এই সরল সত্যটা বুঝতে আমাদের প্রগতিশীল সুশীল সমাজের এত সময় লাগছে? ১৯৯৩ সালে স্টিভেন স্পিলবার্গ যখন ইহুদিদের ওপর নাৎসিদের অত্যাচারের ছবি বানালেন তখন তিনি হলিউডে খ্যাতির প্রায় শীর্ষে। কেউ খেয়ালই করেনি যে জস (১৯৭৫) বা ইটি দ্য এক্সট্রা টেরেস্টারিয়াল (১৯৮২)-এর মতো সব ছবির পরিচালক ভদ্রলোকটি আসলে একজন ইহুদি। যার মনের গভীরে ইহুদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ওই প্রথিতযশা পরিচালককে এমন একটা মর্মবিদারক চলচ্চিত্র বানাতে প্রেরণা দিয়েছে। সারা পৃথিবী স্টিভেন স্পিলবার্গকে মনে রাখবে এক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে। আর ইহুদি সমাজ পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে মনে রাখবে তাদের অসীম দুঃখ-কাহিনি তিনি চলচ্চিত্রায়ন করেছেন বলে। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র জগতের দুর্ভাগ্য যে তা দাউদ ইব্রাহিমদের ডি-কোম্পানির পেট্রোডলারের লোভ কাটিয়ে বের হতে পারল না। মুক্তমনের শিল্পীসত্তা নিয়ে নবজাগরণের যুগে বাংলার লেখক শিল্পীরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে পারলেন না। তাই আজকে পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা ডি-কোম্পানির পাপের টাকার মতো আরব সাগরের জলে কালের স্রোতে হারিয়ে যাবেন। কেউ স্টিভেন স্পিলবার্গ হয়ে থেকে যাবেন না। ■

উত্তরপ্রদেশের পুরভোটে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়, গুজরাটেও প্রভাব ফেলবে

উত্তরপ্রদেশের পুরভোটে নিরঙ্কুশ জয় হয়েছে বিজেপির। ওই রাজ্যের মানচিত্র থেকে মুছে গেছে কংগ্রেস এবং তার দোসর অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। রাজ্যের ১৬টি পুরসভা বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৪টিতে বিজয়ী বিজেপি। বাকি দুটিতে জিতেছে মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টি। গান্ধী পরিবারের একদা দুর্ভেদ্য গড় আমেঠি কেন্দ্রে এখন শুধুই কমল ফুল। আমেঠি নগর পঞ্চায়েতের ভোটে নিশ্চিহ্ন কংগ্রেস। জয়ের মুকুট বিজেপির মাথায় পরিয়েছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ। পুরভোটে বিজেপি প্রার্থীরা জিতেছেন অযোধ্যা, বারাণসী, গোরক্ষপুর, লখনউ, মিরাট, এলাহাবাদ, গাজিয়াবাদ, বরেলি, মোরাদাবাদ, আগ্রা, ঝাঁসি, কানপুর, মথুরা ও ফিরোজাবাদে। রাহুল গান্ধীর সংসদীয় কেন্দ্র আমেঠিতে কংগ্রেস চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছে। সারা দেশে জি এস টি চালু হওয়ার পর এটাই ছিল বিজেপির প্রথম ভোট। এর প্রভাব পড়তে পারে গুজরাট বিধানসভার ভোটে। হ্যাঁ, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কুরশিতে বসার পর মুসলমান তোষণকারী দেশের বুদ্ধিজীবীরা গেল গেল রব তুলে আকাশ পাতাল এক করে দিয়েছিলেন। হিন্দুত্ববাদের নামে হিংসার তাণ্ডব চলবে রাজ্যজুড়ে। রিম রিম কাগজ নষ্ট হয়েছে এইসব বিশ্বনিন্দুক বুদ্ধিজীবীদের গরম গরম লেখায়। উত্তরপ্রদেশে নারীর সম্ভ্রম নেই। গোরক্ষা বাহিনীর তাণ্ডবে ভীত সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ দেখা যাচ্ছে যে বিজেপিকে আগ্রা, লখনউ, গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ঢেলে ভোট দিয়েছে। অযোধ্যার নির্দিষ্ট স্থানেই রাম মন্দির গড়া হবে এই ঘোষণার পর বিরোধীরা আশা করেছিল মুসলমানরা একজোট হয়ে বিজেপিকে সবক শেখাবে। কিন্তু তা হয়নি। অযোধ্যায় বিপুল ভোটে বিজেপি প্রার্থীরা জিতেছে। গুজরাটের নির্বাচনের ঠিক মুখে বিজেপির এই সাফল্য আশা ও আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। যে বার্তা বশংবদ সাংবাদিকদের কাছ থেকে

গূঢ় পুরুষের কলম

আমাদের রাজ্যের চটি পিসি পাননি। আর পাননি বলেই তিনি তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন লোকসভা নির্বাচনে কীভাবে বিজেপিকে হারানো যায় তার কৌশল ঠিক করতে। যে পার্টির নেতা নিজের রাজ্যেই একটি আসন জিততে পারে না তাকে সেনাপতি করে চটি পিসি ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখছেন। পিসির শিবিরে মড়কে সব সাবাড় হয়ে গেছে। বাতি জ্বালাবার কেউই নেই।

চটি পিসির বিজেপি বিরোধী শিবিরের শেষ আশা এখন গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর সেনাপতিত্বে কংগ্রেসের সাফল্য। যে রাহুল আমেঠির গড় রক্ষা করতে ব্যর্থ সেই ব্যক্তি গুজরাটে সাফল্য পাবেন কীভাবে? এর উত্তর আমার জানা নেই। হয়তো চটি পিসির বিশ্বাস যে সেখানে হার্দিক প্যাটেল, অল্পেশ ঠাকোর, জিগনেশ মেবানির মতো উঠতি নেতারা কংগ্রেস দলকে অক্সিজেন জোগাবেন। বাস্তব তা নয়। হার্দিক পাতিদারদের একাংশের নেতা। তিনি গুজরাটে পাতিদার সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের আওতায় আনতে চান। একইভাবে ওবিসি আন্দোলনের মুখ অল্পেশ ঠাকোর। তিনিও সংরক্ষণের কোটার বৃদ্ধি চান। হার্দিকের দাবি ও বি সি কোটায় পাতিদারদের ঢোকাতে হবে। পাতিদারদের এই দাবির বিরোধিতা করেই আন্দোলনে নেমেছিলেন অল্পেশ। তাঁর রাজনৈতিক উত্থান ক্ষত্রিয়, ঠাকোর সেনাদের পাশে নিয়ে। অন্য দিকে, জিগনেশের উত্থান গোরক্ষকদের হাতে দলিতদের নির্যাতনের প্রতিবাদে। সৌরাষ্ট্রের উনায় গোরক্ষক বাহিনী দলিতদের উপর হামলা চালায়। তার বিরুদ্ধে দলিত অস্মিতায় যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়ে জিগনেশের রাজনীতিতে প্রবেশ। জিগনেশের নেতৃত্বে দলিতরা মৃত গোরুর চামড়া ছাড়ানোর পেশা ছেড়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বিজেপি বিরোধিতায় তাঁরা তিনজনই এখন রাহুলের শিবিরে।

প্রশ্নটা এখানেই। পাতিদার নেতা হার্দিক চাইছেন ওবিসি কোটায় পাতিদারদের যুক্ত করতে। এতে তীব্র আপত্তি অল্পেশ ঠাকোরের। গুজরাটে ওবিসিরা হলেন রাজ্যের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। এরা সংরক্ষণের আওতায়। এখন রাহুল গান্ধী হার্দিক এবং অল্পেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদের চাহিদা মেনে সংরক্ষণ দেওয়া হবে। কীভাবে? ওবিসিদের কোটা কেটে সেখানে পাতিদারদের স্থান দিলে ওবিসিরা তা মেনে নেবেন না। তাঁদের শান্ত করতে গেলে সংরক্ষণ দিতে হবে প্রায় ৫০ শতাংশকে। গুজরাটের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংবিধান বিরোধী এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা মেনে নেবেন না। অবিশ্বাস্য, অসত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে গুজরাটবাসীকে বোকা বানানো যাবে না। তাই বলছি, গুজরাটে বিজেপি পুনর্বার ক্ষমতায় ফিরছেই।

গুজরাটের ভোট

মোট আসন : ১৮২। প্রথম দফা : ৯ ডিসেম্বর। আসন সংখ্যা-৮৯। জেলা-১৯। দ্বিতীয় দফা : ১৪ ডিসেম্বর। আসন-৯৩। জেলা-১৪। গণনা ১৮ ডিসেম্বর।

শীত পড়বে, কিন্তু দিদির উৎসবের কী হবে?

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

শীত মানেই উৎসব, মেলা। আর বাংলা মানেও উৎসব, মেলা। দিদি আপনার আমলে বাংলার এটা বড় পাওনা। রসগোল্লা উৎসব তো নতুন সংযোজন। কিন্তু উৎসব জমবে কি?

আবহাওয়া দপ্তর বলছে, এবার শীত নাকি জাঁকিয়ে পড়বে। আবার রাজনীতির আবহাওয়াবিদরা বলছেন, উত্তাপও জাঁকিয়ে পড়বে আগামী কয়েকটা মাসে। বলছেন, এই শীতে উত্তুরে হাওয়া যতই থাকুক রাজনীতির হাওয়াও থাকবে।

সামনে গুজরাট নির্বাচন। একই সঙ্গে হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে ফল ঘোষণা ১৮ ডিসেম্বর। আগাম সমীক্ষার ফল বলছে ভাল ফল করবে বিজেপি। আবার গুজরাটের চলতি হাওয়া দেখে রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, জয় পেলেও ভয় কাটবে না বিজেপির। কেউ কেউ তো বিজেপির তুলনায় রাহুল, হার্দিকদের এগিয়ে রাখছেন। বেশি করে আবার বাংলা সংবাদপত্র।

শুধু জয় নয়, ভাল জয় চাই বিজেপির। কারণ, এই রাজ্য নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর রাজ্য। এখানকার ফল বলে দেবে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির তথা মোদীর জনপ্রিয়তায় কতটা জোয়ার, কতটা ভাটা আসতে পারে।

আর এই ফলের উপরে নির্ভর করছে অন্যান্য রাজ্যে বিজেপির আগাম পরিকল্পনা কেমন হবে। গুজরাটে যদি বিজেপির ফল দুর্দান্ত কিছু হয় তবে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সামনেই বিধানসভা ভোট থাকা ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজেপি। কিন্তু মনে রাখা দরকার অমিত শাহরা গুজরাটে ধাক্কা খেলে তবে বিজেপির কলিঙ্গ কিংবা বঙ্গ আক্রমণ আরও জোরদার হবে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি গুজরাটে সবকটি আসনেই জয় পায়। সেখানে নতুন করে আসন বাড়ানোর উপায় নেই। তাই অন্য রাজ্যে নির্ভরতা বেশি। উত্তরপ্রদেশে ভাল ফল করলেও আগেই লোকসভায় সেখানে প্রায় সব আসনে দাপট দেখিয়েছে পদ্ম।

এখন তাই গুজরাটে বিজেপি ফল খারাপ করুক আর ভাল, বাংলার দিকে নজর পড়বেই। কেন্দ্রের ক্ষমতায় ফের নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে যেতে বিজেপি নেই এমন রাজ্যে শক্তি বাড়ানোই হবে বড় লক্ষ্য। এর মধ্যে রয়েছে এই রাজ্য। আর তাতে মুকুল রায়ের তোলা 'বিশ্ববাংলা' অভিযোগই নেবে মুখ্য ভূমিকা। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের 'মূল' দিদির উপরে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানাই বিজেপির প্রধান টার্গেট। আর সেটাই করবেন মুকুল রায়। জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে।

আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে সফর শুরু করছেন সদ্য দলে যোগ দেওয়া মুকুল রায়। যাত্রা চলবে টানা ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। মুকুল রায়ের এই এক মাসের কর্মসূচি এই রাজ্যে বিজেপিকে আরও বেশি আলোচনায় রাখবে।

এই সফরের সময়ে দিদি আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেসের নজরদারি বাড়বে নিজেদের উপরেই। কোথায় কোন নেতা কাছে এলেন, কে যোগাযোগ করলেন এসব আলোচনায় থাকবে। আবার কোথায় কোথায় মুকুলের টানে সমাবেশে ভিড় হলো, কোথায় কোথায় পাল্টা সমাবেশ করতে হবে তা নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

মুকুল রায়ের রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু দিদিমণি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বিরোধী হিসেবে কীভাবে খবরে থাকতে হয় তা তাঁর অজানা নয়। যেখানে সমাবেশে লোক টানতে পারবেন না সেখানেও কী করে খবরে থাকতে হয় তা দিদিমণির কাছেই শিখেছেন মুকুল। নিশ্চয়ই প্রয়োগ করবেন। তাই এটা নিশ্চিত রাজ্যে পারদ যতই নামুক, শীতের সকালে চায়ের দোকানের আড্ডায় উত্তাপ থাকবেই। তুফান উঠবে চায়ের ভাঁড়ে।

—**সুন্দর মৌলিক**

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা।।